ভাওয়ালের ইতিহাস।

জয়দেবপুর স্কুলের পণ্ডিত
শ্রীনবীনচন্দ্র ভদ্র প্রণীত।

ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

১৫ই চৈত্র ১২৮১। ২৮ শে মার্চ্চ ১৮৭৫।

শ্রীঈশানচন্দ্র শীল প্রীণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভাওয়ালের ইতিহাস।

জয়দেবপুর স্কুলের পণ্ডিত

শ্রীনবীনচন্দ্র ভদ্র প্রণীত।

ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

১৫ই চৈত্র ১২৮১। ২৮শে মার্চ্চ ১৮৭৫।

শ্রীঈশানচন্দ্র শীল প্রীণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিজ্ঞাপন।

আমি কতিপয় প্রাচীন লোকের ও বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের সাহায্যে ভাওয়ালের কতকগুলি প্রাচীন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া আধুনিক বৃত্তান্তের সহিত ভাওয়ালের ইতিহাস নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানী প্রণয়ন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ খণ্ডভূমির আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট, সুতরাং জনশ্রুতিতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট। জনরবে যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি, শ্রমসাধ্যে তৎসংগ্রহে ত্রুটি করি নাই; এইক্ষণ পুস্তকখানী পাঠোপযোগী হইলেই, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

অনন্তর কৃতজ্ঞচিত্তে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে উল্লিখিত রায় বাহাদুর মহাশয় সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছেন।

জয়দেবপুর। } শ্রীনবীনচন্দ্র ভদ্র।
১২৮১। ২ চৈত্র

ভাওয়ালের ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

জনরব আছে যে ভাওয়ালে রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদি রাজ্যে শিশুপালের রাজধানী থাকা জানা যায়, তদনুসারে ভাওয়াল চেদিরাজ্যের অংশ বলিয় বোধ হয়। কোন কোন তন্ত্রের লিখনাভাসে কামাক্ষ্যা দেশের দক্ষিণ সীমা বৃদ্ধ গঙ্গা (বুড়ী গঙ্গা) ও চেদিদেশ কামাক্ষ্যার এক অংশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

কামাক্ষ্যাদেশে হংস পারাবত প্রভৃতি কতিপয় পাখী দেবার্চ্চনায় ও বিপ্রাদির ভোজনে বিহিত ও প্রচলিত, ভাওয়ালেও তৎপ্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে; যদিচ বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, চন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানেও উক্ত প্রথা দৃষ্ট হয়, তথাপি তত্তৎস্থানে তাহা অবৈধ ও নিন্দনীয়, কিন্তু ভাওয়ালে প্রাচীন কালাবধিই তৎপ্রথা

বধভাবে চলিয়া আসিতেছে। অপিচ কামাক্ষ্যা দেশে কামদেবের পূজা প্রচলিত আছে, ভাওয়ালেও উক্ত দেবতার পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু ভাওয়ালের সন্নিহিত অন্যান্য স্থানে কামদেব পূজা দৃষ্ট হয় না; এসমস্ত কারণ প্রযুক্ত ভাওয়াল, কামাক্ষ্যাদেশের অংশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বৃদ্ধ গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বর্ত্তমান ঢাকা নগরী যে স্থানে স্থিত, উক্ত স্থানও পূর্ব্বে ভাওয়ালের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল; খ্রীঃ১৬০৮অব্দে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর খাঁ উহা ভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া ইস্‌লাম খাঁ নবাব দ্বারা উহাতে স্বকীয় নামানুসারে একটী নগর (জাহাঙ্গীর নগর) স্থাপন করেন, তাহাই এক্ষণে ঢাকা নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভাওয়ালের সীমাদি।

নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ভাওয়ালের উত্তর সীমা আলাপসিংহ, পুখরিয়া ও আটীয়া পরগণা; দক্ষিণ সীমা বুড়ী গঙ্গা ও লক্ষানদী, পূর্ব্ব সীমা

হাজরাদী, মহেশ্বরদী পরগণা এবং মেঘনা ও লক্ষ্মা নদী; পশ্চিম সীমা দুর্গাপুর ও কাশীমপুর। এই বিভাগানুসারে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা প্রভৃতি স্থানও ভাওয়ালের মধ্যে গণ্য হয়। রাজকীয় বিভাগানুসারে ঢাকার উত্তর হইতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ইহার সীমা ; লক্ষ্মা নদীর পূর্ব্বে তুরাক নদীর পশ্চিমে বহু পরিমিত ভূমি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। ঢাকার উত্তর হইতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ এবং লক্ষ্মার পশ্চিম হইতে তুরাকের পূর্ব্ব, ইহার মধ্যেই প্রায় ৫৭৯ বর্গ মাইল অর্থাৎ ১১২০৯৪৪ বর্গ বিঘা ভূমি আছে এবং এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থানের বিবরণই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহাতে পাকা বাটী ৮ ও কাঁচা বাটী ১২৭১৬ খানা। লোক সংখ্যা প্রায় ৬৫৩৮৬। তন্মধ্যে হিন্দু ২৭৬০৫ ও মুসলমান ৩৭৭৮১। ভাওয়ালে ভদ্র লোক অতি অল্প; উল্লিখিত লোক সংখ্যার মধ্যে ষোড়শাংশের অর্দ্ধাংশও ভদ্রলোক আছে কিনা সন্দেহ।

ভাওয়ালে যে ভূমিপরিমাণ উক্ত হইল,

তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক ভূমি পতিত ও জঙ্গল ময়। এস্থানের মধ্য দিয়া কোন বৃহৎ নদী প্রবাহিত হয় নাই, কেবল বালু নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদী ডেমরার নিকট হইতে ক্রমশঃ অপ্রশস্তা হইয়া উত্তরাভিমুখে ভাওয়ালে প্রবেশ করিয়াছে এবং টঙ্গীনদী নাম্নী আরও একটী ক্ষুদ্র নদী আছে, ইহারদ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বা অন্য কোন বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছেনা।

বেলাই নামে ভাওয়ালের মধ্যে একটী বিল অতি প্রসিদ্ধ, এই বিলের অধিকাংশ ভূমিই পতিত। বর্ষাকালে ভাওয়াল ও তচ্চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানের লোকে গোরুর আহারার্থ এই বিল হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘাস কাটিয়া লয়। বর্ষা বিগতে এই বিল অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠে, জল কমিয়া গেলে নৌকার চল থাকে না, অথচ পদব্রজে চলাও নিতান্ত দুষ্কর হয়। পদব্রজে চলিতে “কান্দানিয়াতে” পতিত হইলে হঠাৎ প্রাণ বিনাশ হওয়াও বিচিত্র নহে। বর্ষাগতে ঐ বিলের কোন২ স্থানের উপরিভাগ শুষ্ক হইয়া সৌরকরে বিলক্ষণ কাঠিন্য লাভ করে,

কিন্তু তাহার নিম্নভাগে তরল কর্দ্দমপূর্ণ গভীর কূপ থাকিয়া যায় ; মনুষ্যাদি গুরুদেহ কোন প্রাণী তাহার উপর দিয়া গমনাগমন সময়ে হঠাৎ ঐ কূপে প্রোথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এইরূপ স্থানকেই ভাওয়ালের লোকে " কান্দানিয়া " বলে।

ভূমির অবস্থা।

পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভাওয়ালের ভূমি উচ্চ এবং ভঙ্গিমতী অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমতল নহে। কোন২ স্থান এত উচ্চ যে স্বর্ণগ্রাম, বিক্রমপুর, চন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি স্থান যখন বর্ষার জলে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখনও তজ্জলে তাহার পাদস্পর্শ করিতেও পায় না। ইহার ভূমির নানাপ্রকার বর্ণ ও অবস্থা। ব্রহ্মপুর, শ্রীপুর, সাতখামাইর, মশাখালী, কংশেরকুল ইত্যাদি অঞ্চলে অরণ্যমাত্রেই নাই, বিলক্ষণ পরিষ্কৃত ভূমি; ঐ সকল স্থানে রোপিত শালীধান্য উত্তম জন্মে। ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও ঈষৎ শুভ্রবর্ণ। লক্ষ্যা নদীর তীরস্থ

বান্দাখলা প্রভৃতি স্থানের ভূমি চর অঞ্চলের ন্যায় বালুকাময়। তাহাতে নানাবিধ শস্য ও ফল জন্মে। বেলাই ও মাখল প্রভৃতি অঞ্চল ডুবা স্থান অর্থাৎ বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান একেবারে জলাকীর্ণ হইয়া যায়। ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকা কালবর্ণ, তাহাতে আমন, খামা ও বোরো ধা-ন্যাদি জন্মে। লক্ষ্মা নদীর তীরস্থ কতকগুলি স্থান অত্যন্ত উচ্চও আছে, উহার মৃত্তিকা রক্ত বর্ণ এবং প্রায় সমুদয় স্থানের মৃত্তিকাই অরণ্য ময়। জয়দেবপুরের কিয়দ্দূর উত্তর হইতে উত্তরে বহুদূর স্থান গজার বৃক্ষে ও বন কাও-লাতে পরিপূর্ণ। উহাতে কণ্টকময় অরণ্য অধিক নাই বটে, কিন্তু বহুস্থান ব্যাপিয়া যে গজারগড় আছে, তাহাতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মহিষাদি হিংস্র জন্তু বাস করে এবং কখন২ আরণ্য হস্তীও আ-সিয়া থাকে। উহার ভূমি টিলাময় অর্থাৎ উহার এক২ স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, কোন কোন টিলা চতুঃপার্শ্বাপেক্ষা ৪০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকার নানাপ্রকার বর্ণ অর্থাৎ কোথাও রক্তবর্ণ, কোথাও শুভ্রবর্ণ

এবং কোথাও কালবর্ণ এবং অধিকাংশ স্থানই কঙ্করময় ইত্যাদি।

বৃক্ষ ও ফল।

ভাওয়ালে পাকুর, গজার, জারুল, শোণারু, শিমূল, পলাশ, পোয়া, আম, জাম, কাঁটাল, তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে গজারই অধিক। জয়দেবপুরের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া মধুপুর পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে ১৮ রৈখিক ক্রোশ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৮ রৈখিক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া একটী গজার গড় আছে। দালানের বর্গা ও গৃহের খুঁটী ইত্যাদি প্রয়োজনে এই গড় হইতে প্রভূত গজার বৃক্ষচ্ছেদিত হইয়া স্থানান্তরে নীত হয়। তথাপি তাহার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস নাই। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে গজারে কয়লা প্রস্তুত হইয়া প্রায় সর্ব্বত্র নীত হইয়া থাকে। ভাওয়ালের সমুদয় অরণ্যের মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে ভাওয়ালের প্রায় অষ্টমাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। এই অরণ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক,

বরাহ, মহিষ ও হরিণ প্রভৃতি বহুবিধ আরণ্যজন্তু বাস করে। সময়ে২ বন্যহস্তীরপালও দৃষ্ট হয়। বিগত ১২৭৮ সনে শ্রীযুক্ত রায় কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর এই অরণ্য হইতেই চারিটী হস্তী ধরিয়াছিলেন, তম্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তীটীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দন্তদ্বয় পরিমাণ করিয়া দেখা গিয়াছে, একটী দীর্ঘে ৭ ফুট ২ ইঞ্চ ও বেড়ে ১ ফুট ৬ ইঞ্চ এবং অন্যটী দীর্ঘে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চ ও বেড়ে ১ ফুট ৮ ইঞ্চ এবং বড়টী ওজনে ১/৩ সের, ছোটটী ৫৭॥ সের। ঐ দন্ত দুইটী উক্ত রায় বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতেই আছে।

গজার ভিন্ন অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে তাল ও কাঁটালই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন২ স্থানে তাল বৃক্ষ এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূর হইতে সুপারি বাগানের ন্যায় বোধ হয়। এসকল ভিন্ন বহুল প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষে এদেশের নানাস্থান অরণ্যময় হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল অরণ্য হইতে প্রতিবৎসর রাশী২ ইন্ধন কাষ্ঠ চতুর্দ্দিকে নীত হইতেছে, তথাপি অরণ্যের হ্রাস নাই।

এখানে আম্র, কাঁটাল, নারিকেল, তাল, বেল, আনারস, দাড়িম, কুল, আতা, পেয়ারা, জাম, কামরাঙ্গা, করমজা, শসা, বাঙ্গী, তরমুজ, খীরাই প্রভৃতি নানাবিধ ফল জন্মে, তন্মধ্যে তাল ও কাঁটাল যেমন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এমত আর কিছুই নহে। তাল ও কাঁটাল এত অধিক উৎপন্ন হয় যে, মালদহ হইতে আ. মের ও ছাতক হইতে কমলার যেমন নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে,এখান হইতেও প্রায় তদ্রূপই জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে কাঁটালের এবং ভাদ্র আশ্বিনে তালের চালান নানাদেশে নীত হয়।

শস্য ও তরকারী।

এখানে ধান্য, সর্ষপ, চিনা, কায়ন, তিল, কলায়, ধনিয়া, দ্বিদল, তামাকু, পাট, মেছট, কালীজীরা, মরীচ, কুসুম প্রভৃতি নানাবিধ শস্য এবং বেগুণ, কাঁচাকলা, ঝিঙ্গা, সিম, পটল, মূলা, আলু, কাকরল প্রভৃতি বহুপ্রকার তরকারী জন্মে। এস্থানের মধ্য দিয়া কোন বৃহৎ নদী প্রবাহিতা নাই, এবং এখানকার কৃষকগণ

অন্যান্য স্থানের কৃষকগণের ন্যায় শ্রমশীলও নহে, তথাপি ভূমির উর্ব্বরতাগুণে অপর্য্যাপ্ত শস্য ও তরকারী উৎপন্ন হয়। চালকুমড়া ও সোনা কুমড়া এখানে অনেক জন্মে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে এখান হইতে চালকুমড়া ও সোনাকুমড়া বিক্রমপুরাদি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নীত হয়। এখান হইতে ধান্য, সর্ষপ, তিল, মুগ প্রভৃতি শস্য নানাস্থানে নীত হইয়া থাকে। পূবাইল ও কালীগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে পাট বিক্রীত ও দেশান্তরে প্রেরিত হয়। এখানকার পাট সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়। সংপ্রতি এখানে একপ্রকার জঙ্গলী পাটও উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও উৎকৃষ্ট। শ্রীযুক্ত রায় কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক এখানে কয়েকটী চা-বাগিচাও প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে চাও বিলক্ষণ জন্মিতেছে। পূর্ব্বে কাপাসিয়া অঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত কার্পাস উৎপন্ন হইত, তদ্ধেতুই ঐ স্থানের নাম কাপাসিয়া হইয়াছে। এইক্ষণ তথায় তদ্রূপ কার্পাসের চাস হয় না।

—০০—

খনিজ।

এখানে লোহা কাচিয়া (চূর্ণিত লৌহের ন্যায় এক প্রকার মৃত্তিকাবৎ পদার্থ) ও লৌহের খনি আছে। কীর্ত্তনীয়া ও লোহাইদ প্রভৃতি স্থানে লৌহময় টিলা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল টিলার উপর বল্মীকের ন্যায় লৌহস্তম্ভ সকল বর্দ্ধিত হইতেছে। কীর্ত্তনীয়া ও লোহাইদ প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বে লৌহের কারবার হইত, তৎপ্রযুক্ত তত্তৎস্থানে প্রভূত পরিমাণে লৌহ আনীত হইত, বোধ হয় ঐ লৌহ দ্বারাই উক্ত লৌহময় টিলা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। লোহালিদাস নামে এক জাতি অদ্যপি ভাওয়ালের স্থানে২ বসতি করিতেছে, উহারাই পূর্ব্বে লৌহের কারবার করিত। ভেরণতলি পীরুজালি, পাইনসাইল, বাউপাড়া, চতর, আতলরা, ভারারুল প্রভৃতি স্থানে লৌহা কাচিয়া অনেক স্থান ব্যাপিয়া রাশীকৃত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি ভাওয়ালের ও ঢাকার রাজপথে প্রক্ষেপ জন্য উহা প্রভূত পরিমাণে নীত হইতেছে। এখানে ব্রহ্মপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এক প্রকার

প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, অত্রত্য লোকে ঐসকল প্রস্তরকে অসুরের হাড় বলিয়া থাকে। রায় বাহাদুর তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করত অগ্ন্যুত্তাপে এক প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য উহা দ্বারা হয় কি না, এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

অধিবাসী।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী ও বনুয়া প্রভৃতি বাস করে। হিন্দু সম্প্রদায় নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; বংশী ও কোচ এই দুই অসভ্য জাতিও হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত। বংশিগণ বলে যে তাহারা বভ্রুবাহনের বংশধর। তাহাদের আদি বাসস্থান মণিপুর, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাণভয়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে ও নানা দিগ্‌দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, তদবধি তাহাদের বংশধরেরা উপবীত ধারণ করে নাই। ইহাদের এই কথা কতদূর সত্য বলা যায় না।

ইহারা মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট, বিলক্ষণ বলবিক্রম-শালী, সাহসী, তেজস্বী ও পরিচ্ছন্ন ; ইহাদের আবাসস্থলও সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। অতিথি সৎকারে ইহাদের বিলক্ষণ ভক্তি যোগ দৃষ্ট হয়। দুর্গা, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনাও করিয়া থাকে। ইহাদের নাক চেপ্টা, মধ্যে২ দুইএকটী লোক বিলক্ষণ সুশ্রীও দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশেরই শরীরের রং তাম্র বর্ণ। বংশীদিগের বিবাহ পদ্ধতিও মন্দ নয়, বরের বয়স ২৪ এর উর্দ্ধ ও কন্যার বয়স ১২ এর উর্দ্ধ না হইলে প্রায় বিবাহ হয় না। ইহাদের স্ত্রীগণ পিত্তল ও কাঁসার নানা অলঙ্কার ধারণ করে, অধুনা অনেকে সোনা রূপার অলঙ্কারও পরিতেছে ; শঙ্খ প্রায় কনুই পর্য্যন্ত ধারণ করে। বংশারা এক স্বতন্ত্র অলিখিত কদর্য্য ভাষায় কথা বার্ত্তা বলে, বাঙ্গলা ভাষাও অনবগত নহে। কেহ২ সাধারণরূপ বাঙ্গলা লেখাপড়াও জানে। কৃষিকার্য্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত রায় কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর ইহাদিগকে

উপবীত ধারণের অনুমতি করিয়াছেন। তাহারা তদ্রূপ আচরণ করিতেছে।

কোচ।—কোচেরা বংশীদের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি, ইহাদের নাক চেপ্টা, দেখিতে অঙ্গ সৌষ্ঠব নহে, কিন্তু দৃঢ়কায়, শ্রমশীল, বলবিক্রম শালী। ইহারা প্রায়ই জঙ্গলে বাস করিতে ভালবাসে। ইহাদের বাড়ীঘর নিতান্ত অপরিষ্কৃত। কৃষিকার্য্য এবং কাষ্ঠ বিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। কোচ কামিনীরা দলে২ কাষ্ঠ বোঝা মাথায় বহিয়া বাজারে বিক্রয় করে। ইহারা পিত্তল নির্ম্মিত দস্তুর চক্রাকার অলঙ্কার হস্তে ধারণ করিয়া থাকে, মোটা শাঁখা পরিতে ভালবাসে। কোচদের বিবাহের কোন উৎকৃষ্ট নিয়ম নাই, পুরুষ ও স্ত্রীর মনোমিলন হইলেই বিবাহ লক্ষণ লক্ষিত হইল। বংশীদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও বাল্য বিবাহ ভালবাসেনা। ইহারা স্ত্রীপুরুষে তুল্য রূপে কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে। অন্যান্য হিন্দু কামিনীর ন্যায় কোচ বধূরা অবগুণ্ঠনবতী নহে। নববিবাহিতা কামিনীও শ্বশুর, ভাসুর প্রভৃতির

সহিত অসঙ্কোচিতচিত্তে কথা বার্ত্তা বলে, তাহাদের সঙ্গে কৃষী ভূমিতে যাইয়া কায কর্ম্ম করে। ইহাদের মধ্যে সাঙ্গা (বিধবার বিবাহ) প্রচলিত আছে। কোচেরা স্ত্রীপুরুষ উভয়ই অত্যন্ত সুরাসক্ত। বংশীদের ন্যায় ইহারাও একটী স্বতন্ত্র অলিখিত কদর্য্য ভাষায় কথা বার্ত্তা বলে, বাঙ্গলা ভাষাও অনবগত নহে, ক্বচিৎ কেহ সাধারণরূপ বাঙ্গালা লেখাপড়াও জানে। ইহারা প্রায়ই গড়ভোম শালনা প্রভৃতি স্থানে বাস করে। ইহারাও দুর্গা, কালী প্রভৃতি কোন২ হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে, কোচদের পুরোহিত আছে; কিন্তু ঐ পুরোহিতের যজ্ঞসূত্র বা অন্য কোন চিহ্ন নাই। ইহারা বলে যে, প্রাচীনকালে হীরা ও জীরা দুই ভগ্নী ছিল, মহাদেবের ঔরসে উভয়েরই গর্ভ হয়, তাহাতে হীরার গর্ব্ভে বংশীজাতি ও জীরার গর্ব্ভে কোচ জাতি উৎপন্ন হয়। কোচেরা বার দুগু অর্থাৎ বার শ্রেণীতে বিভক্ত, উহাদের মধ্যে কেহ দোষী হইলে ঐ বার শ্রেণীর বারজন একত্র হইয়া তাহার বিচার করে।

ফিরিঙ্গী।—ফিরিঙ্গীরা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের আচার ব্যবহার প্রায় মুসলমানের ন্যায়, কেবল বিবাহ ও ভজনাদি খৃষ্টানদিগের মতানুসারে হইয়া থাকে। ইহারা লক্ষ্মা নদীর তীরস্থ বান্দাখোলা প্রভৃতি স্থানে বাস করে; কৃষিকার্য্যে ইহারা বিলক্ষণ পটু।

বনুয়া।—বনুয়ারা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের আচারে চলিতে দেখাযায়। ইহাদের গলায় মালা আছে, অথচ কুক্কুটাদির মাংসও ভক্ষণ করে। ইহাদের পুরোহিত আছে, কিন্তু ঐ পুরোহিতের উপবীত বা অন্য কোন চিহ্ন নাই। ইহারা পুষ্প, দুর্ব্বা, নৈবিদ্য ও বলি প্রদানাদি দ্বারা বনদেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। স্ত্রীরা অবগুণ্ঠনাবৃতা থাকে না। কোচ কামিনীদিগের ন্যায় বনুয়ানীরাও কৃষি ভূমি ইত্যাদিতে যাইয়া অশঙ্কোচিতচিত্তে কার্য্য করে। কৃষিকার্য্য এবং চাকুরীই ইহাদের জীবনোপায়। বনুয়াদের বিবাহ সম্বন্ধে একটী কৌতূহলজনক ব্যাপার আছে। যদি

কোন পুরুষ কোন কুমারীর ললাটদেশে সিন্দুর লাগাইয়া দেয়, তাহা হইলেই ঐ পুরুষ তাহার স্বামী হইল। ঐ স্ত্রী এবং তাহার অভিভাবকদের অসম্মতিতেও যদি ঐরূপ সিন্দুর লাগাইয়া দেয়, তবে ঐ সিন্দুরদায়ক পুরুষ ভিন্ন অন্য পুরুষে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারেনা, করিলে সমাজচ্যুত হয়। ইহারা বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিয়াই কথাবার্ত্তা বলে। বনুয়ারা গান বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ ভালবাসে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সুরাপানে অতিশয় অনুরক্ত। ইহাদের মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, বনুয়ানীরা হস্তে শঙ্খও ধারণ করে। বনুয়ারা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, দৃঢ়কায়, শ্রমশীল, ইহাদের বাড়ী ঘর আচার ব্যবহার সকলই কদর্য্য।

সাঁকোসারের পশ্চিমদিকে মাধবচালা গ্রামে সিদ্ধিমাধব নামে এক দেবতা আছেন। শক্তি—পাষাণময়ী দশভুজা মূর্ত্তি। হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় লোকেই তাঁহার অর্চ্চনা করে। হিন্দুগণ যেমন পাঠা বলিদান করেন, মুসলমানগণও সেইরূপ কুক্কুট বলিদান করিয়া

থাকে। হিন্দু মুসলমানে এক দেবতার উপাসনা করিতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শিল্প।

এখানকার অধিবাসিগণ ছাতী, পাখা, সূর্প, সুতার কাপড়, ঢেকী, চৌকি, মেজ, মাচিয়া, আলমারী, নৌকা, ঘটী, বাটি, বন্দুক প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু তৎসমুদয় বিশেষ প্রশংসনীয় হয় না এবং কেহ কোন বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করত প্রশংসাভাজন হইবার নিমিত্ত সমধিক যত্নও প্রকাশ করে না। স্থূলতঃ অত্রত্য লোক বিদ্যা বুদ্ধির ও অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য কিছুমাত্র যাত্নিক নহে। সংপ্রতি শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুরের প্রযত্নে নানা বিষয়ের উন্নতির অঙ্কুর দৃষ্ট হইতেছে।

ঋতু।

গ্রীষ্ম।—এই পরগণার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশস্থ লক্ষ্মা নদীর তীর সন্নিহিত স্থান ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব

ত্রই গ্রীষ্মাধিকা। গ্রীষ্মকালে লোক সকল দি-নের বেলায় ঘরের বাহির হইতে প্রাণান্ত বোধ করে; বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া জনগণের বিষম যাতনাদায়ক হইয়া উঠে। জয়দেবপুর গ্রামে কখন২ গ্রীষ্মের এতদূর আতিশয্য হয় যে, তাপ মান যন্ত্রের পারদ শতাংশ-পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে।

বর্ষা।—সন্নিহিত অন্যান্য দেশাপেক্ষা এস্থান উচ্চ, তন্নিবন্ধন যখন বিক্রমপুর স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি নিকটস্থ স্থান সকল বর্ষার জলে প্লাবিত হয় তখনও এখানে বর্ষার চিহ্ন লক্ষিত হয়না। অনেক স্থান আছে যে বৃষ্টির জল ভিন্ন জোয়া-রের জলের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট।

শরৎ।— সাধারণতঃ বর্ষার জলেই শরৎ কালের সমধিক রমণীয়তা সম্পাদন করে, এদেশে বর্ষার প্রাদুর্ভাব না থাকাতে সন্নিহিত অন্যান্য স্থানাপেক্ষা শরৎকালেরও কিঞ্চিন্ন্যূন মনোহারিত্ব অনুভূত হয়।

হেমন্ত ও বসন্ত।—নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুর,

চন্দ্রপ্রতাপ, স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হেমন্ত ও বসন্ত প্রকৃতির যেরূপ শোভা, এখানেও তদ্রূপই লক্ষিত হয়, কোন ইতর বিশেষ অনুমান করা যায়না।

শীত।—এখানে পৌষ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত শীতের প্রবলপ্রতাপ, তৎপর হইতে ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে; কিন্তু চৈত্র পর্য্যন্তও সম্বন্ধ ত্যাগ করেনা। চৈত্র মাসে দিবা ভাগে রৌদ্রের উত্তাপে শরীর আচ্ছন্ন করে, অথচ রাত্রিকালে শীতও বিলক্ষণ অনভূত হয়, এমন কি কখন২ লেপও ব্যবহার না করিলে চলেনা।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা শিশুপাল।

ভাওয়ালের উত্তর পশ্চিমাংশে দিবল্লীর ছিট নামক বহুদুর স্থান ব্যাপিয়া কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ও প্রাচীরের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে এক গড়খাই দৃষ্ট হয়, অধুনা

তাহা ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়াছে, সুতরাং তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। জনশ্রুতিতে জানাযায় যে ইহাই রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল। উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী শৈলাট নামক গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বৃহদায়ত প্রাচীন পুষ্পোদ্যানের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে তাহাতে মুচুকুন্দ, নাগকেশর, গুলাচী এবং বৃহৎ২ চাম্বল প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হয়। জনরব আছে যে উহাই উল্লিখিত ভূপতির পুষ্পবাটীকা ছিল, লোকে ঐ স্থানকে "ফুলসাঙ্গনেরগড়" বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের উত্তরাংশে শিশুপালের বাস্তবাটী ছিল। পুরাণে উক্ত আছে চেদীদেশে শিশুপাল রাজার রাজধানী ছিল, চেদী যে কামাক্ষা দেশের অন্তর্নিবিষ্ট প্রদেশ তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতপ্রভৃতি পুরাণে শিশুপাল রাজার বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে. অতএব বাহুল্য বিবেচনায় তদ্বিবরণ বর্ণনে বিরত রহিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই দেশ শিশু-পাল রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল, ঐ রাজার রাজত্ব বিলোপের পর কাহার অধীনে কি ভাবে ছিল তাহার কিছু নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়না, জনশ্রুতিতে জানাযায় যে শিশুপাল রাজার বহুকাল পরে এখানে কতকগুলি ইতর লোক স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। অনন্তর প্রতাপ রায় ও প্রসন্ন রায় নামক চণ্ডাল বংশীয় দুই যমজ সহোদর এদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। প্রতাপ ও প্রসন্নরায়ের আদিবৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য জনক। প্রবাদ আছে যে এদেশ যখন কতক গুলি ইতরলোকের স্বপ্রধানাবস্থায় ছিল, তাহার শেষভাগে চণ্ডাল কুলোদ্ভবা এক দুঃখিনীর গর্ব্ভে যমজপুত্র জন্মে। গো-রক্ষণ ভিন্ন ঐ রমণীর জীবনোপায়ের আর অন্য আশ্রয়ছিলনা। নিরাশ্রয়া যখন গরু চরাইবার জন্য অরণ্যের পার্শ্বস্থ মাঠে গমন করিত, তখন ঐপুত্র দুইটিকেও সঙ্গেই লইয়া

যাইত এবং তাহাদিগকে কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় শায়িত করিয়া গো-রক্ষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণকরিত, ও সময়ে২ আসিয়া তাহাদিগকে স্তন্য প্রদান করিয়া যাইত। যে২ সময়ে সূর্য্যদেব স্বীয় গতি-ক্রমে শায়িত শিশুদ্বয়ের শরীর হইতে ছায়াকে অপসৃতা করিয়া প্রখর কিরণে তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিতেন, সেই২ কালে নিকটস্থ অরণ্য হইতে এক ভীষণ সর্প আসিয়া তাহাদের উপর ফণা বিস্তার করত সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়া থা-কিত। একদা তাহাদের জননী আসিয়া এই ব্যাপার সন্দর্শনে সন্তানের অপায় আশঙ্কায় অভিভূতা হইয়া দীননয়নে কাতরস্বরে নানা প্রকার দেবদেবীর মানস করিতে লাগিল, কিয়ৎ কাল পরে তাহাকে দেখিয়া সর্প প্রস্থান করিল। অনন্তর সে যাইয়া স্নেহ বিগলিতচিত্তে শিশুদ্বয় ক্রোড়ে করিয়া বাটীতে চলিয়া গেল, তদবধি আর ঐ শিশুদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া মাঠে আনিত না। তৎপর এক দিবস ঐ রমণী নিদ্রাযোগে স্ব প্নাবেশে এইরূপ দেখিতে পায় যে উক্ত সর্প যেন আসিয়া তাহাকে বলিল যে, "আমি সর্প

নই, তুমি আর আমাকে দেখিয়া ভয় করিওনা, আমি স্বর্প রূপী হইয়া তোমার এই ঈশ্বরানুগৃ-হীত ভাবী ভূপতনয়দ্বয়ের রক্ষা ও ক্লেশ নিবা রণার্থ ঐরূপ ফণা বিস্তার করিয়া থাকি। ভবিষ্যতে তোমার পুত্রদ্বয় এদেশের রাজ্যপদ লাভ করিয়া প্রবল প্রতাপশালী হইবে। আর তোমার গর্ভে আর একটি কন্যা সন্তানও জন্মিবে; তুমি ঐ বালকদ্বয়ের প্রতাপ ও প্রসন্ন নাম রাখিও।" চণ্ডালবণিতা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া একের প্রতাপ ও অপরের নাম প্রসন্ন রাখিল এবং কালক্রমে একটি কন্যা প্রসব করিয়া তাহার মধী নাম রাখিল।

কালসহকারে ঐ চণ্ডাল কুমারদ্বয় বিলক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধির কৌশলে ও বাহুবলে ভাওয়াল চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানের আধিপত্য লাভ করিয়া বর্ত্তমান জয়দেবপুর গ্রামের প্রায়-৬ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন ও রায় উপাধি ধারণ করে। রাজবাটীর চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি রাজাবাড়ী গ্রামে প্রাচীরা-

নই, তুমি আর আমাকে দেখিয়া ভয় করিওনা, আমি স্বর্প রূপী হইয়া তোমার এই ঈশ্বরানুগৃহীত ভাবী ভূপতনয়দ্বয়ের রক্ষা ও ক্লেশ নিবারণার্থ ঐরূপ ফণা বিস্তার করিয়া থাকি। ভবিষ্যতে তোমার পুত্রদ্বয় এদেশের রাজ্যপদ লাভ করিয়া প্রবল প্রতাপশালী হইবে। আর তোমার গর্ব্ভে আর একটি কন্যা সন্তানও জন্মিবে; তুমি ঐ বালকদ্বয়ের প্রতাপ ও প্রসন্ন নাম রাখিও।" চণ্ডালবণিতা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া একের প্রতাপ ও অপরের নাম প্রসন্ন রাখিল এবং কালক্রমে একটি কন্যা প্রসব করিয়া তাহার মঘী নাম রাখিল।

কালসহকারে ঐ চণ্ডাল কুমারদ্বয় বিলক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধির কৌশলে ও বাহুবলে ভাওয়াল চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানের আধিপত্য লাভ করিয়া বর্ত্তমান জয়দেবপুরগ্রামের প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন ও রায় উপাধি ধারণ করে। রাজবাটীর চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি রাজাবাড়ী গ্রামে প্রাচীরা-

দিরু ভগ্নাবশেষ ও পরিখা দীর্ঘিকা প্রভৃতি বর্ত্ত-
মান আছে। রাজবাটীর সন্নিহিত একটি মঠের
ও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, লোকে উহাকে মঘীর
মঠ বলিয়া থাকে এবং রাজবাটীর প্রায় দুই
মাইল অন্তর একটি দীর্ঘিকা আছে,ঐদীর্ঘিকাতে
মনোহর শ্বেতপদ্ম সকল দৃষ্ট হয়; প্রবাদ
আছে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের ভগিনী মঘী
উল্লিখিত মঠ ও দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় রাজপদ লাভ ক-
রিয়া স্বজাতীয়দিগের বিদ্যা বুদ্ধির ও অবস্থার
উৎকর্ষসাধন জন্য বিশেষ যত্নবান হন এবং স-
কলকে অনুরোধ করেন, কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষা
করিতে গেলে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে ব-
লিয়া তাহারা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় প্রতাপ
ও প্রসন্ন রায় কৌশলক্রমে, চাষারা স্বকীয় কৃষি
কার্য্য চালাইয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে, চাষা
নাগরী নামে এমত একপ্রকার নূতন লেখা প্র-
স্তুত করেন। তাহাই স্বজাতীয়দিগকে শিক্ষা
দেন। ভাওয়ালে এখনও চণ্ডাল জাতির মধ্যে
কেহ২ চাষা নাগরী অবগত আছে, তদ্দ্বারা বিল

ক্ষণ অঙ্কগণনা ও হিসাবাদি করিয়া থাকে, চাষা নাগরীতে কতিপয় পুস্তকও তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিবস গত হইল পূর্ব্বোক্ত মঘীর মঠের সম্মুখে কতকগুলি অক্ষর যুক্ত এক খণ্ড তাম্রার পাত পাওয়া গিয়াছিল। অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব জমীদার স্বর্গীয় মহাত্মা গোলোক নারায়ণ রায় চৌধুরী তাহা আনাইয়া ঐ অক্ষর গুলি পড়াইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহা চিনিতে না পারিবায় ঢাকার কোন একজন বিজ্ঞ ইংরেজের নিকট পাঠান, তথায়ও কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে পারেননা, তৎপর তাহা কলিকাতায় প্রেরিত হয়, কিন্তু সেখানেও কেহ পাঠকরিতে নাপারায় অবশেষ তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। বোধ করি উক্ত অক্ষরগুলি চাষা নাগরীই হইবে। এখানে যাহারা চাষানাগরী অবগত আছে, তাহাদিগকে ঐতাম্র শাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিলনা।

রাজবাড়ীর পশ্চিম দক্ষিণাংশে চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত একটি টিলা আছে, এখানকার লোকে ঐ টিলাকে বন্দানের টেক কহে। রাজা

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় তথায় একটি কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া অপরাধীদিগকে তথায় বন্দী রাখিতেন। অবস্থা দৃষ্টে ঐ টিলাটি কারাগারের উপযুক্ত স্থান বলিয়াই বোধ হয়।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের রাজত্ব অনেক দিন স্থায়ী হইয়া ছিলনা, তাঁহাদের সৌভাগ্যের সহিত অহঙ্কারও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন অচিরেই রাজত্ব সহ জীবনধনও ব্রহ্মকোপে সমর্পণ করেন, তাঁহারা স্বাধীন রাজা হইয়া তুচ্ছ জাতিত্বে কাল যাপন লজ্জা ও অপমানজনক বিবেচনা করত ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতিকে তাঁহা-দের পক্কান্ন ভোজন করাইয়া সমজাতিত্ব লাভের বাসনা করেন এবং তদনুসারে একদা ভাওয়াল, চন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মণগণ রাজদণ্ড ভয়ে অগত্যা স্বীকৃত ও ভোজনের নির্দ্ধারিত সময়ে আগত হইলেন। বসিবার স্থান প্রস্তুত, ভোজনার্থ সকলে স্বস্ব আসনোপবিষ্ট, প্রতাপ রায়ের স্ত্রী ও প্রসন্ন রায়ের স্ত্রী পরিবেশনোদ্যতা, ইতোমধ্যে জনৈক

বয়োজ্ঞান বৃদ্ধ চতুর ব্রাহ্মণ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের স্ত্রীদ্বয়কে বলিলেন যে "আমরা রাজান্ন ভোজন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি বা অশ্রদ্ধা করিব না, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি রাজ্যেশ্বরী পাটরাণী, তিনিই পরিবেশন করিবেন।" প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় তাঁহাদের এই আপত্তি শ্রবণ করত চাতুর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পরস্পার স্বস্ব স্ত্রীর প্রাধান্য হেতু ভ্রাতৃবিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে বিবাদ বর্দ্ধিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় ও সেই যুদ্ধে উভয়েই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারা রাজা হইয়া এইরূপে অল্পদিন মধ্যেই নির্ম্মূল হন, বোধ করি এই হেতুই লোকে "চাঁড়ালের রাজত্ব আড়াইদিন" বলিয়া থাকে। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের রাজত্বের সীমার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যাহা-হউক যখন তাঁহারা স্বাধীন রাজা ছিলেন, তখন যে তাঁহাদের রাজ্য অল্পায়তন ছিল এমত বোধ হয়না।

তৃতীয় অধ্যায়।

গাজী বংশ।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের রাজত্বের পর এই দেশের স্বাধীনতা বিলোপ হইয়া যায় এবং সমগ্রদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। কোন্ সম্রাট্ কোন্ সময়ে কি প্রকারে অধিকার করেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়না। তৎকালে ভাওয়ালের অন্তঃপাতী চৈরা গ্রামে যবন জাতীয় গাজী বংশীয়েরা বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তদ্বংশীয় পহন্নুন সা গাজী সম্রাট্ হইতে জমিদারী সূত্রে বর্ত্তমান চাঁদপ্রতাপ, কাশীমপুর, তালেপাবাদ, সুলতানপ্রতাপ ও ভাওয়াল এই পাঁচ পরগণা একত্রে বন্দোবস্ত করিয়া লন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সা কারকরমা গাজী ঐ জমিদারী ভোগ করেন। চাঁদগাজী, আজমত গাজী; (কাশীমগাজী) সুলতান গাজী, তালেপ গাজী, ভাওয়াল গাজী, (বড় গাজী) এবং বাহাদুর গাজী নামে কারকরমা গাজীর ছয়

পুত্র ছিল, কারকরমা কিছুকাল জমিদারী ভোগ করিয়া মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বকীয় জমীদারী পুত্রগণকে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান, যাহাকে যে অংশ প্রদান করেন, তাহারই নামানুসারে সেই অংশের নাম রাখা হয়. অর্থাৎ চাঁদগাজীর নামানুসারে চাঁদপ্রতাপ, কাশীমগাজীর নামানু-সারে কাশীমপুর, সুলতান গাজীর নামানুসারে সুলতান প্রতাপ, তালেপ গাজীর নামানুসারে তালেপাবাদ ও ভাওয়াল গাজীর নামানুসারে ভাওয়াল পরগণা হয় *। বাহাদুর গাজী সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও অল্প বয়স্ক থাকা হেতু তাহাকে ও তাহার উপযুক্ত জমীদারীর অংশ বড় গাজীর হস্তেই ন্যস্ত করিয়া যান।

বড় গাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুরগাজী ভাওয়ালের কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। তৎপর বাহাদুর গাজীর পুত্র মাহাতাপ গাজী যখন উক্ত পরগণার কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেই সময়ে ভাওয়াল ভিন্ন পহন্মুন সা

---

* সুবর্ণ গ্রামও পূর্ব্বে ভাওয়াল পরগণার সামিল ছিল।

গাজীর বন্দোবস্তীয় অন্যান্য স্থান গাজীদের হস্ত চ্যুত হইয়া যায়। মাহাতাপ গাজীর পর তৎপুত্র ফাজীল গাজী, তৎপর তৎপুত্র নুরগাজী, নুর গাজীর পুত্র হীরা গাজী ও দৌলতগাজী ইহারা ক্রমে ভাওয়ালের কর্ত্তৃত্ব পদ লাভ করেন। হীরাগাজী ও দৌলত গাজী পূর্ব্বে একত্রে জমীদারীর কর্ত্তৃত্ব করেন। একখানী সনন্দ দৃষ্টে জানা যায় যে হীরাগাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে তদ্ভ্রাতা দৌলত গাজী ১০৫০ কি ৫১ হিজরি সনে দিল্লীর সম্রাট হইতে ভাওয়ালের এক নূতন বন্দোবস্তীর এই সনন্দ আনয়ন করেন। এতদপেক্ষা ভাওয়ালের উপরিউক্ত গাজীবংশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চৈরা নামক গ্রামে গাজীদের বাসস্থান ছিল ঐ স্থান ভাওয়ালের পূর্ব্বাংশে লক্ষ্মানদীর তীরস্থ বর্ত্তমান কালীগঞ্জ মহকুমার নিকটস্থিত। তথায় গাজীদের রাজধানীর অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। চৈরার সন্নিহিত কালী-

গাঁও নামক স্থানে গাজীদের নির্ম্মিত বিলক্ষণ কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটী বৃহৎ এবং প্রাচীন মস্‌জিদ ছিল, তৎকালের গাজী বংশীয়গণ তথায় যাইয়া ধর্ম্মোপাসনা করিতেন, সংপ্রতি শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর উহার ভগ্নাবশেষের ইষ্টকাদি উঠাইয়া স্থানান্তরে নিয়াছেন। ঐ মস্‌জিদের দ্বারদেশে আরবী অক্ষর যুক্ত একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ফলক ছিল, তাহাও জয়দেবপুরে আনীত হইয়াছে। তাহার সকল অক্ষর সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না, অতীব প্রাচীন বিধায় কোন২ অক্ষর একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টপাঠে অনুমান হয়, তাহাতে মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের লিপি ছিল।

শিশুপাল রাজার রাজত্ব কাল হইতে ভাওয়ালে বহুসংখ্যক লোকের বাসস্থান ছিল এবং নানা স্থানে প্রাচীন ভগ্ন বাটিকা ও দীঘি পুষ্করিণ্যাদি দৃষ্টে হিন্দু ও ধনাঢ্য ভদ্রবিশিষ্ট লোকও যে অনেক ছিলেন,তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। অনন্তর এদেশ গাজীদের অধিকার

হইলে তাঁহারা মুসলমানদিগকে যেরূপ আদর সম্মান করিতেন, হিন্দুদের প্রতি তদ্রূপ ছিলনা, হিন্দুদিগের বংশ ও গুণানুযায়ী মর্য্যাদা কিছুই হইতনা, এই হেতু তৎসময় হইতেই ভাওয়ালে মুসলমানদিগের প্রাধান্য হইয়া উঠে, তজ্জন্যই ভদ্রবিশিষ্ট হিন্দুপরিবারগণ নানা স্থানে চলিয়া যান। বিশেষতঃ গাজীদের নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাচারিতাই ভাওয়ালের শ্রীহীনতার প্রধান কারণ; এমন কি তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তও এতদূর ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতেন যে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং নেত্রবারি বিগলিত হইতে থাকে। নদীতে নৌকা ডুবিলে জলমগ্ন হইয়া কিরূপে লোকের মৃত্যু হয়, এই কৌতুক দেখিবার জন্য তাঁহারা নিরুপায় প্রজাদিগকে নৌকা সমেত লক্ষ্মানদীতে ডুবাইয়া দিতেন। গর্ভে সন্তান কিরূপে থাকে, তাহা দেখিবার জন্য গর্ভবতীর উদর বিদীর্ণ করিয়া সন্তান অবলোকন করিতেন, তাহাদের দৌরাত্ম্যে তৎকালে কোন ধনাঢ্যের ধন কি রূপবতী

স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা হইত না। দুরাত্মা গাজি-গণ বলপূর্ব্বক লোকের ধনাপহরণ ও মান সম্ভ্রম নষ্ট করিতেন। ইচ্ছা হইলে নিতান্ত নিরপরাধ শান্তশীল ব্যক্তিকেও নানারূপ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা দিয়াছেন। অথচ ভয়ানক পাপাচারীকেও বিশিষ্টরূপ আদরসম্মান করিয়াছেন। চৈরা, ঈশ্বরপুর, চান্দাইয়া প্রভৃতি গ্রামে গাজীদের কতকগুলি কৈবর্ত্তজাতীয় পোষা দস্যু ছিল, তাহারা লক্ষ্মানদীর তীরস্থ নাগটেকী নামক দস্যু ভয়ের প্রসিদ্ধ স্থানে থাকিয়া ও নানা দিগ্দেশে যাইয়া ডাকাইতী করিত। গাজীগণ তাহাদিগকে সম্মানে রাখিয়া তাহাদিগহইতে ডাকাইতী লব্ধধনের অংশ গ্রহণ করিত। তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ স্বস্ব বিত্ত সম্পত্তি রক্ষার জন্য উক্ত দস্যুগণকে বার্ষিক কিছু২ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতেন। ঐ দস্যুদিগকে বার্ষিক দিয়া তাহাদের নিকট হইতে লাঠী বা অন্য কোন চিহ্ন নিয়া যে গ্রামে রাখা যাইত সেই গ্রামে আর ডাকাইতীর ভয় থাকিত না, অর্থাৎ ডাকাইতগণ

আক্রমণ করিলে উক্ত চিহ্ন দেখাইবামাত্রই ফিরিয়া যাইত। উহাদের পর উহাদের বংশ ধরেরাও পরস্পর দস্যুবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্ব সময়ে ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জান্ পার্টিসিন্ সাহেবের সময়ে উহাদের মধ্যে বলরাম সরদার ও দুলাল সরদার নামক দুই ব্যক্তি ধৃত হইয়া বিচারান্তে একের প্রাণ দণ্ড ও অপরের দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে, তদবধি প্রাগুক্ত নাগটেকী নামক স্থানের দস্যুভয়ও নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে।

ভীষণ দৌরাত্ম্যকারী গাজীদের অধিকারের পূর্ব্বে যে এদেশে অনেকানেক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসছিল, স্থানে২ তাহার বিলক্ষণ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়াযায়। যেসকল ভূমি এইক্ষণ ঘোর অরণ্যাবৃত হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানই ভগ্ন ইষ্টকালয় ও দীর্ঘিপুষ্করিণ্যাদিতে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ভুমির সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। অল্পদিন হইল কাপাসিয়া ষ্টেসনের অধীন বড়চালা নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ

মন্দির দৃষ্ট হয়, বাবু কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর তাহার ইষ্টকাদি উঠাইয়া স্থানান্তরে নেওয়ার সময় উহার ৪।৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সচরাচর শিবলিঙ্গের যেরূপ আকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহার আকৃতি তাহা হইতে বিভিন্ন। উহাতে আর একখণ্ড প্রস্তর ফলকও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,ঐফলকের একপৃষ্ঠে গড়ুরবাহন ও এক বাসদেব মূর্ত্তি এবং অপর পৃষ্ঠে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি বিষ্ণুর দশাবতার খোদিত আছে। মুজাপুর নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ঐরূপ এক মন্দিরের চিহ্ণ পাইয়া তাহা খনন করিবার সময় উহার অভ্যন্তরে দুইটী যজ্ঞকুণ্ড লক্ষিত হয়, ঐ কুণ্ডের মধ্যে যজ্ঞীয়ভস্মের ন্যায় কতক গুলি ভস্ম ও ঘৃতের স্তরের ন্যায় স্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ঐ ভস্মে দগ্ধঘৃতের গন্ধ অনুভূত হইয়াছিল। যাহাহউক গাজীদের পূর্ব্বে ভাওয়াল যে ভদ্র ও ইতর লোকে পরিপূর্ণ ছিল তাহার সংশয় নাই, পরে তাহাদের অসদ্ব্যবহারে ঐসকল লোক দিগদিগন্তরে চলিয়া যাওয়াতে

এস্থানের অধিকাংশ ভূমি পতিত ও ঘোরতর অরণ্যময় হইয়া রহিয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়।

গাজীবংশের অধঃপতন।

গাজিগণ তাঁহাদের জমীদারীর মালগুজারি (রাজকর) যাহা দিল্লীর সম্রাট্ সরকারে দিতেন, তাহা ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক আদায় হইত, ঐ রাজকর আদায় জন্য ভাওয়ালের অন্তঃপাতী ধীরাশ্রম নামক গ্রামে নবাবের এক কাছারী ছিল, অদ্যাপি লোকে ঐ স্থানকে নবাবের কাছারি বলিয়া চিহ্নিত করে।

গাজিগণের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায় শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া, ভাওয়ালের বহুসংখ্যক প্রজা ভাওয়াল পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে চলিয়া যায়, বিশেষতঃ দৌলত গাজীর সময়ে ভাওয়ালে প্রজার সংখ্যা এত বিরল হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা নবাব সরকারের কর চলাই দুষ্কর হইয়াছিল। যখন রাজকর আদায় জন্য নবাব স-

রকারে গাজীদিগের তলপ হইত, তখন গাজিগণ নাগটেকী ও একডালা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত দস্যুদিগের আশ্রয় লইয়া থাকিতেন। বাদসাহী আমলে রাজকর আদায়েরও কোন সুনিয়ম ছিল না, রাজকরের তলপ হইলে জমীদারগণ পলায়ন করিয়া অথবা ধৃত হইলে মার পীট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেই রাজকর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, অথবা কোন চতুর জমীদার নবাব কি বাদসাহ সরকারের কর্ম্মচারীদিগকে কিছু অর্থ দিয়া বশীভূত করিতে পারিলেই রাজকরের তলপ হইতে রক্ষা পাইতেন।

উপরিউক্ত প্রকারে দৌলত গাজীর নিকট বহুকালীয় রাজকর বাকী হওয়াতে ঢাকার নবাব সরকারের সহিত তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং ঐ মোকদ্দমার বিচারও ঢাকার নবাবের নিকটই হইয়াছিল, তাহাতে দৌলতগাজী পরাস্ত হন। তৎকালে ঢাকার নবাবের অসম্মতিতে মুরসিদাবাদের নবাবের নিকট আপীল হইত, তদনুসারে দৌলত গাজী মুরসিদাবাদের

নবাবের নিকট আপীল উপস্থিত করেন; ঐ সময়ে কুশধ্বজ রায় নামক জনৈক মান্যমান বিচক্ষণ লোক মুরসিদাবাদের নবাব সরকারে উকীল নিযুক্ত ছিলেন, দৌলত গাজী তাঁহাকেই আপন পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিলেন। কুশধ্বজ রায় ওকালতনামা গ্রহণ করিয়া নানারূপ চতুরতা ও পরিশ্রম পূর্ব্বক মোকদ্দমায় জয় লাভ করেন। দৌলত গাজী তাহাতে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপন পক্ষে তাঁহাকে চিরস্থায়ী রূপে উকীল নিযুক্ত করেন।

কুশধ্বজ রায় বিক্রমপুরান্তর্গত বজ্রযোগিনীর পূশিলাল বংশোদ্ভব ছিলেন। উক্ত বংশীয় কেশব পণ্ডিতের রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক পুত্র ছিলেন। রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যা শিক্ষার জন্য মুরসিদাবাদের নিকটস্থ বীর দেশের অন্তঃপাতী গোকর্ণ গ্রামে এক অধ্যাপকের নিকট যাইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন; ঐ অধ্যাপকও তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করান। অধ্যাপকের পুত্র সন্তান ছিল না, অষ্টমবর্ষীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী কন্যামাত্র ছিল এবং কি-

ঞ্চিৎ ভু-সম্পত্তিও ছিল। অষ্টধাতু নির্ম্মিতা সর্ব্ব-মঙ্গলা নাম্নী দশভুজা এক মূর্ত্তি ও মাধব নামে পাঁচটী চতুর্ভুজ পাষাণ বিগ্রহও তাঁহার বাটীতে স্থাপিত ছিল। তিনি স্বীয় দুহিতাকে সদ্বংশজ একটী উপযুক্ত পাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপন বাটীতে জামাতা ও দুহিতাকে স্থাপিত করিয়া যান, এই মনন করিয়াছিলেন; ঈশ্বরেচ্ছায় অনায়াসেই তাঁহার সেই অভীষ্ট সিদ্ধির লক্ষণ ঘটিয়া উঠিল! রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সদ্বংশজ এবং বিলক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যশালী ছিলেন, সুতরাং তিনিই অধ্যাপকের অভিলষিত পাত্র স্থানীয় হইলেন। অধ্যাপক তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করত আপন বাটীতে স্থাপিত করিয়া কিয়ৎকাল পরে মানবলীলা সংবরণ করেন।

অনন্তর রুদ্রচক্রবর্ত্তী ও নারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র জন্মে, পৈতৃক রীত্যনুসারে তাঁহারাও পাণ্ডিত্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করেন।

প্রাগুক্ত নবাব সরকারের উকীল কুশধ্বজ রায় উল্লিখিত নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইনি

পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া রাজকীয় কার্য্যকলাপের রীতি নীতি শিক্ষাপূর্ব্বক অভিজ্ঞতালাভ করত মুরসিদাবাদের নবাব সরকারে উকীল নিযুক্ত হন; নবাব তাঁহার বিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতা দর্শনে "রায়রায়া" উপাধি প্রদান করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইঁহারই বুদ্ধি কৌশলে দৌলত গাজী ঢাকার নবাবের সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন এবং তদ্ধেতু দৌলত গাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া নবাব সরকারে আপন পক্ষে চিরস্থায়ীরূপে উকীল নিযুক্ত করেন, তদবধি কুশধ্বজ রায় দুর্গোৎসব ও মহরমাদির বন্ধ উপলক্ষে মধ্যে২ গাজীদের বাটীতে আসিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত বেড়াইয়া যাইতেন। এবং ভাওয়ালের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে রুদ্র চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণের সহিত কুশধ্বজ রায়ের মনোবাদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে নূতন বাটী নির্ম্মাণের মনন করেন এবং দৌলত গাজীর নিকট এই প্রস্তাব করিলে,

দৌলত গাজী তাঁহাকে আপন এলাকা ভাওয়া-
লের যে কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি জায়-
গীরস্বরূপ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে
বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাসকরার অনুরোধ করেন।
দৌলত গাজীর এই অনুরোধের পূর্ব্বেই তাঁহার
অন্তঃকরণে এরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল
যে স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষদের আদিম বাস্তুস্থান বজ্র-
যোগিনীতে যে বহু সংখ্যক জ্ঞাতিগণ বাস
করিতেছে তাহার সন্নিহিত কোন স্থানে আ-
সিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিবেন। এইক্ষণ দৌলত
গাজী তাঁহাকে উক্তরূপ অনুরোধ ও ভূমিদানের
অঙ্গীকার করাতে তাঁহার সে বাসনা অনায়া
সেই পূর্ণ হওয়ার উপায় হইয়া উঠিল।

অনন্তর কুশধ্বজ রায় ভাওয়ালের নানা
স্থান পর্যাটন ও অন্বেষণপূর্ব্বক বর্ত্তমান জয়দেব-
পুরের পশ্চিমস্থ ব্রহ্মপুর অঞ্চলের অন্তর্গত-
চান্দনা গ্রামে আবাসস্থান মনোনীত করিয়া
দৌলত গাজীর নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে,
দৌলত গাজী উক্ত গ্রামে তাঁহার বাসোপযোগী
বাটী ও তৎসামীলে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি প্রদান

করিলেন। ব্রহ্মপুর অঞ্চলও গোকর্ণ সদৃশ স্থান, এপ্রযুক্তই কুশধ্বজ রায় ঐ স্থান মনোনীত করেন। কুশধ্বজ রায় তথায় এক বাটী নির্ম্মাণ করত গোকর্ণে যাইয়া প্রথমে পিতৃব্য পুত্রগণের সহিত পৃথক হন, পরে গোকর্ণস্থ বিত্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে রুদ্র চক্রবর্ত্তীর সন্তানদিগকে দেন এবং আপনি পাষাণ বিগ্রহ মাধবের পঞ্চমূর্ত্তি লইয়া নৌকাযোগে সপরিবারে ভাওয়াল যাত্রা করেন। তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্যষষ্ঠীর কিয়ৎদিবস পূর্ব্বে তুরাক নদীর তীরস্থ কড্ডা নামক স্থানে নৌকা লাগাইয়া পরিবার ও মাধবের পঞ্চমূর্ত্তিসহ চান্দনা গ্রামে নূতন বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে মাধবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে এতদঞ্চলে ও নানাদিকে এই কথা রাষ্ট্র হয় যে এরূপ দেবমূর্ত্তি কেহ কখন দর্শন করে নাই, মাধব প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া দৃঢ়তর ভক্তি যোগ সহকারে নানা স্থানের ভূরি২ লোক যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তদুপলক্ষে

নানাদিগ্ দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রভূত লোকের আগমনে তথায় অরণ্যষষ্ঠী দিবস একটী মেলা সংস্থাপিত হয়; ঐ মেলায় ক্রয় বিক্রয়ার্থ যে সকল দ্রব্য আনীত হইয়া ছিল তাহার মূল্য ধরিয়া নয়লক্ষ টাকা নিশ্চয় করা হইয়াছিল, তদ্ধেতু ঐ মেলার নাম " নবলক্ষী " রাখা হয়। কুশধ্বজ রায় অবধি তাঁহার পরবর্ত্তী অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত মেলা ঐরূপ নিয়মে অরণ্যষষ্ঠী দিবস কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত চান্দনা ও কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে মিলিয়াছিল। তৎপর কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের আমলেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মিলিয়া অল্প কতক বৎসর হইল প্রসিদ্ধ মহাজন বালিয়াটী নিবাসী জগন্নাথ বাবু ও ঢাকা নিবাসী মধু বাবুর চক্রান্তে উক্ত মেলা উঠিয়া গিয়াছে।

কুশধ্বজ রায় ভাওয়াল আসিয়া স্থিত হইলে পর প্রায়ই দৌলত গাজীর বাটীতে আসা যাওয়া ও তাঁহার জমিদারীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেন। তিনি দেখিলেন যে দৌলত গাজীর কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও কাজ

কর্ম্ম একান্ত বিশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে। অতএব তিনি দৌলত গাজীকে এই সকল বিষয় অবগত করাইলে দৌলত গাজী তাঁহাকেই সর্ব্বে সর্ব্বারূপে আপনার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন। কুশধ্বজ রায় দৌলত গাজীর দেওয়ান হইয়া অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগকে অপসৃত ও কার্য্যদক্ষ লোক নিযুক্ত করার মনন করিলেন। তৎকালে ভাওয়ালের অন্তর্গত গাছা গ্রাম নিবাসী বর্ত্তমান জমীদার বাবু মহিমাচন্দ্র ঘোষের পূর্ব্বপুরুষ এক ব্যক্তি বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন; কুশধ্বজ রায় বহু অন্বেষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আনাইয়া নায়েবী পদ প্রদান করত মপস্বলের সমুদায় ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং উক্ত নায়েবের জ্ঞাতি পলাসোনা নিবাসী অন্য একজন কার্য্যদক্ষ লোককে খরচের সিরিস্তার প্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন এবং ধৌর নিবাসী মিত্র বংশীয় জনৈক উপযুক্ত ব্যক্তিকে রোবকারনবিসের পদে ও সাতখামাইর নিবাসী সরকার বংশীয় কয়েক ব্যক্তিকে খরচ সিরিস্তার মোহরেরি পদে

ও কুমুননিবাসী শ্যামবংশীয় এক ব্যক্তিকে নায়েবের সিরিস্তায় প্রধান মোহরেরি পদে নিযুক্ত করেন, এতদ্ভিন্ন বাড়িয়া গ্রামের ঘোষ ও নাগবংশীয় কতিপয় বিজ্ঞলোককে অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অতি সুশৃঙ্খলরূপে কর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। উপরিউক্ত লোক সকল মধ্যে সাত খামাইরের সরকার বংশ ও ধৌরের মিত্র বংশ নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, অন্যান্যের বংশধরগণ অদ্যাপি ভাওয়ালেই বর্ত্তমান আছে।

কুশধ্বজ রায় স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ও নানা প্রযত্নে দৌলত গাজীর জমীদারীর কার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার সুশৃঙ্খলা করেন বটে, কিন্তু দৌলত গাজীর চরিত্র পৈতৃক ধারানুযায়ীই রহিয়া যায়। তৎকালেও প্রজাগণ তাঁহার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলনা। কিয়ৎকাল পরে কুশধ্বজ রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বিলক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ও কার্য্যদক্ষ বলরাম রায় (জানকীনাথ রায়) তৎপদে নিযুক্ত হইয়া দৌলত গাজীর জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্য পিতার ন্যায় প্রশংসার

সহিতই চালাইতে লাগিলেন ; কিন্তু দৌলত-গাজীর চরিত্র দোষে প্রজাগণ তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সময়মতে খাজানা আদায় না হওয়াতে বাদসাহ ও নবাবগণও তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ বলরাম রায়ের সহিত ঐক্য হইয়া তাঁহার দ্বারাই বাদসাহ সরকারের কর আদায় করিতে লাগিল, তাহাতে বাদসাহ ও নবাবগণ বলরাম রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গাজীবংশের নাম তব্‌দিলে বলরাম রায়ের নামে জমীদারীর জেম্মাদারী দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বলরাম রায় একাকী তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন কিনা এই আশঙ্কায় আপন সঙ্গে দৌলতগাজীর দুই একজন প্রধান কর্ম্মচারীও যোগ করিতে অভিপ্রায় করেন এবং তদনুসারে গাছার ঘোষ বংশীয় পূর্ব্বোক্ত মপস্বলের সর্ব্বে সর্ব্বা নায়েবকে ও পলাসোনার ঘোষ বংশীয় পূর্ব্বোক্ত খরচ সিরিস্তার প্রধান কর্ম্মচারীকে আপন সঙ্গে এক পরামর্শে রাখিয়া স্বীয় নামে সাত আনির ও গাছার ঘোষের নামে সাত

আনির এবং পলাসোনার ঘোষের নামে দুই আনির জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। ঐ সময়েই বলরাম রায় ও গাছার ঘোষ বংশ বাদসাহ হইতে "চৌধুরাই" পদবীপ্রাপ্ত হন। উক্ত জমীদারীর ও "চৌধুরাই" পদবীর সনন্দ অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণের ঘরে বর্ত্তমান আছে।

দৌলতগাজীর দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ তাঁহার বিদ্রোহী থাকাতে মপস্বলে আসিয়া জমিদারী দখল করিতে বলরাম রায়ের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল না; প্রজাগণ দৌলত গাজীকে বেদখল করিয়া তাঁহার সহিত ঐক্য হওত নির্ব্বিরোধে খাজানা ইত্যাদি আদায় করিতে লাগিল; কাজে২ দৌলত গাজী সাক্ষীগোপাল হইয়া রহিলেন। তদবধি গাজীবংশ পরম্পর অধঃসোপানে অবতরণ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে গাজীদিগের বংশধরগণ নিতান্ত হীনাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত চৈত্রাগ্রামে ও তৎসন্নিহিত জাঙ্গালিয়া নামক স্থানে কিয়ৎপরিমাণ নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছে।

বলরাম রায় যদিচ দৌলতগাজীর উৎপী-

ড়ন হইতে প্রজাগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দৌলতগাজীর চাকর হইয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার জমিদারী আত্মসাৎ করাতে তিনি (বলরাম রায়) যে নিতান্ত ধর্ম্ম-বিগর্হিত প্রবঞ্চনা মূলক কার্য্য করিয়াছিলেন একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

বর্ত্তমান জমিদার পুশিলাল বংশ।

প্রথম, বলরাম রায় চৌধুরী।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার বলরাম রায় এবং গাছা ও পলাসোনার ঘোষ বংশীয়েরা বাদসাহ হইতে জমিদারীর সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সকলে একবাক্যে নানারূপ সুনিয়মের সহিত জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিয়ৎকাল পরে রঘুনাথ রায়, রাজীবলোচন রায় ও শ্রীকৃষ্ণ রায় নামক তিন পুত্র রাখিয়া বলরাম রায় চৌধুরী পরলোক প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ রায় ও মধ্যম রাজীব

লোচন রায় চৌধুরাই কার্য্য গ্রহণে অসম্মত হন, কিন্তু কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রায় উক্ত কার্য্য গ্রহণে উৎসুক হইয়া মুরসিদাবাদের নবাবের নিকট গমন করত পিতৃলব্ধ চৌধুরাই পদবী বহাল রাখার ও পরগণার পৈতৃক সাত আনী হিস্যার মালগুজারী আদায় করার ভার গ্রহণের প্রার্থী হইলে নবাব তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরীক্ষা করিয়া প্রার্থনা পূরণ জন্য দিল্লীর বাদসাহার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ঐ আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইয়া আসিলে তিনি মুরসিদাবাদের নবাব হোসন সাহা হইতে ১০৮৮ হিজরি সনের ৬ই জেলহজ্জ নূতন এক চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। উক্ত পত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

দ্বিতীয়, শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।

শ্রীকৃষ্ণ রায় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল চাম্পাগ্রামে বাস করেন, অনন্তর তথায় তৎকালে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানারূপ হিংস্র

জন্তুর যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে, এই হেতু তিনি এস্থান পরিত্যাগকরিয়া পীড়াবাড়ী (যাহা এইক্ষণ জয়দেবপুর বলিয়া বিখ্যাত) নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন, এবং অনুরোধক্রমে মধ্যমভ্রাতা রাজীবলোচন রায়কেও আপন সঙ্গে আনিয়া স্বকীয় বসত বাড়ীর তুল্যাংশের অধিকারী করত পূর্ব্বাংশে স্থিরতর করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রঘুনাথ রায় পীড়াবাড়ী যাইতে অসম্মত হইয়া জয়দেবপুরের সন্নিহিত দেওরা নামক স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিলেন, তথায় তাঁহার বংশধরগণ চারিপুরুষ পর্য্যন্ত বাস করিয়া নির্ম্মূল হইয়াছেন; তাঁহাদের বসত বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজীবলোচন রায়ের বংশধর নারায়ণদাস রায় ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্র কলত্রের সহিত জয়দেবপুরে পূর্ব্বোক্ত বাটীতে সসম্ভ্রমে বাস করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রায় তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। জ্যেষ্ঠ জগৎ রায়, মধ্যম শ্যাম রায়, কনিষ্ঠ জয়দেব রায়। জয়দেব রায় সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, এই

জন্য শ্রীকৃষ্ণ রায় মৃত্যুর প্রাক্কালে জগৎ ও শ্যাম রায়কে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত কিয়ৎপরিমাণ ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সমগ্র জমিদারী জয়দেব রায়কে দিয়া যান, এবং পূর্ব্ব বাটীতে জগৎ রায়কে রাখিয়া অন্য দুই বাটীতে শ্যাম ও জয়দেব রায়কে সংস্থাপন করিয়া যান, জগৎ রায়ের বংশধরগণ চারি পুরুষের পর নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছেন। শ্যাম রায়ের বংশধর রামকুমার রায় পুত্র কলত্রের সহিত জয়দেবপুর গ্রামে সসম্মানে কালযাপন করিতেছেন।

তৃতীয়, জয়দেব রায় চৌধুরী।

জয়দেব রায়ের সময়ে পলাসোনার ঘোষ বংশের, যিনি ভাওয়ালের দুই আনী হিস্যার মালিক ছিলেন, তাঁহার এক পুত্র ছিল, ঐ পুত্র অতি নির্ব্বোধ ও রাগান্ধ থাকাপ্রযুক্ত তৎসহ মনোবাদ হওয়াতে তিনি তাঁহার দুই আনী হিস্যার জিম্মাদারী জয়দেব রায় চৌধুরীকে সমর্পণ করিয়া যান, তদবধি জয়দেব রায়ের বংশ-

ধরগণ ভাওয়ালের নয় আনী হিস্যার মালিক হন। জয়দেব রায় উক্ত দুই আনী হিস্যা সমেত নয় আনী হিস্যার মালিক হইয়া সমধিক প্রতাপান্বিত হন এবং তৎসময়েই পীড়াবাড়ীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বকীয় নামানুসারে জয়দেবপুর নাম রাখেন।

জয়দেব রায় বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি চৌধুরাই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে এদেশে যে নবাব সরকারী আবাদকারী জয়হোর সিংহ ও কাননগুই মুচ্ছদ্দিগণ ছিল, তাহাদের সঙ্গে এক যোগে কর্ম্ম করার জন্য হিজরী ১০৮৮ সনের এক লিখন প্রাপ্ত হন। স্বকীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু কার্য্যের উন্নতি দর্শাইলে জয়েনহোসেন খাঁ তাঁহাকে মাসিক ৭৫ টাকা পুরস্কারীর এক সনন্দ প্রদান করেন। অনন্তর ক্রমশঃ স্বকীয় কর্ম্মের সমধিক উন্নতি দর্শাইলে ১১২৬ সনের ৪ ঠা জেলকদ ১০০ শত টাকা মাসিক পুরস্কারের এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর আপন বুদ্ধিকৌশলে অতি সুশৃঙ্খলরূপে জমিদারীর শাসন সংরক্ষণ

করত ইন্দ্রনারায়ণ রায় নামক এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর যাত্রা করেন।

চতুর্থ, ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের সময়ে গাছার ঘোষ বংশের সাত আনীর জমিদার যিনি ছিলেন, তাঁহারও নাম ইন্দ্রনারায়ণ রায় ছিল, তৎপ্রযুক্ত উভয়ের মৈত্রীভাব ও সমধিক আত্মীয়তা জন্মে, এবং তদবধিই উভয় জমিদার বংশের পরস্পার সম্পর্ক বন্ধন চলিয়া আসিতেছে। উভয় ইন্দ্র নারায়ণ রায় আপোসে ভাওয়াল ।।/০ আনী ও ।৶০ আনী এই দুই হিস্যামতে বণ্টন করিয়া দখল করেন, ঐ বিভাগ অদ্যাপি বলবৎ আছে।

ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের শাসনকালে ভাওয়ালের নানা স্থানে হিংস্র জন্তুর এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ কখন২ দিবাভাগেও সুযোগক্রমে লোকালয়ে আসিয়া উপদ্রব জন্মাইত। ঐ সময়ে জয়দেব-

পুরবাসী লোক সকল সন্ধ্যার পর হিংস্র জন্তুর ভয়ে আপন২ বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাচীর বেষ্টিত বাটীতে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করিত। নানাস্থানে এইরূপ হিংস্রজন্তুর ভয় হওয়াতে ভাওয়ালের বহু সংখ্যক প্রজা ভাওয়াল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া যায়, এপ্রযুক্ত ভাওয়াল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অরণ্যাবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রজার সংখ্যা ন্যূন হওয়াতে ও পরগণার বহু পরিমাণ ভূমি পতিত থাকাতে সদর খাজানা চলাই কঠিন হইয়া উঠিল। এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া উভয় ইন্দ্রনারায়ণ রায় ভাওয়ালের জঙ্গল আবাদ ও হিংস্র জন্তুর নিবারণ করার নানারূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

নয়আনির জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার বাটীর প্রায় পোয়া মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্রায়তন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বকীয় নামানুসারে ইন্দ্রেশ্বর শিব সংস্থাপন করেন, অদ্যাপি ঐ শিব ও তাঁহার আবাস মন্দিরের ভগ্না-

বশেষ রহিয়াছে। ঐ স্থান শিববাড়ী নামে প্রসিদ্ধ, উহাতে এইক্ষণ দুইটি বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে।

উপরিউক্ত বৃত্তান্ত ভিন্ন ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্বন্ধে আর অধিক কিছু পাওয়া যায় না। ইনি কত বৎসর জমিদারী ভোগ করেন, তাহারও নিশ্চয় নাই। তাঁহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও কিছু শ্রুত হওয়া যায়না। যাহাহউক তিনি কিয়ৎকাল জমিদারীর শাসন সংরক্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠ বিজয় নারায়ণ রায়, মধ্যম চন্দ্রনারায়ণ রায় ও কনিষ্ঠ কীর্ত্তিনারায়ণ রায় এই তিন পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

---

৫ ম, বিজয়নারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ রায় চৌধুরী।

বিজয় নারায়ণ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বীয় নামে জমিদারী ইস্তকালী করিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় সহ একত্রেই জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য

নির্ব্বাহ করেন। এই সময়ে ভাওয়াল নানা কারণে হতশ্রী হওয়াতে ইহার উপস্বত্ব দ্বারা সদর খাজানা চলাই দুষ্কর হইয়া উঠে। জমিদারগণ সদর খাজানার ভয়ে কতকগুলি ক্ষীণ উপস্বত্বের ভূমি এ পরগণা হইতে ছাড়িয়া অন্যান্য পরগণার সামিল করিয়া দেন। নয় আনীর ৯ নম্বর ভুক্ত জোয়ার ফতেপুর নামক স্থান ভাওয়াল হইতে খারিজ দিয়া দুর্গাপুর পরগণার সামিল করিয়া দেন। ঐ সঙ্গে শাখরাউড়ি নামক মৌজাও পরিত্যাগ করেন। কাপাসিয়া ও রূপগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী তুমলিয়া জোয়ার জামালপুর ও নাগরী ইত্যাদি স্থান পাদরিগণ সামিলে ভুক্ত হইয়া যায়। কয়ের, দত্তপাড়া, বীরতৈল ইত্যাদি বহুপরিমাণ ভূমি অন্যান্য জমিদারীর সামিল করিয়া দেন।

নয়আনীর জমিদার বিজয়নারায়ণ রায়, সাত আনীর জমিদারের সঙ্গে একপরামর্শে ভাওয়ালের উন্নতি জন্য অনেক মৌজা কিসমত নিস্কর দিয়া ও বিনামূল্যে তালুক লিখিয়া দিয়া নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ ও ভদ্রবিশিষ্ট লোক

আনয়নপূর্ব্বক ভাওয়ালে স্থাপন করেন। ঐ সময়েও নবাবী যন্ত্রণা একেবারে নিরাকৃত হইয়াছিলনা, নবাবী জায়গীর বলিয়া কোন২ স্থানের খাজানার জন্য তখনও তাঁহাদিগকে মধ্যে২ পূর্ব্বোক্ত ধীরাশ্রমের কাচারীতে নিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দিত। রাজনগরের রাজারও তৎকালে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিলে। তিনি একদা নবাগ্নি ও পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষে এতদ্দেশীয় সমুদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন, তাহাতে ভাওয়াল ভিন্ন সমুদয় স্থানের ব্রাহ্মণগণই তথায় উপস্থিত হন। ভাওয়ালের ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত আসিলেন না, রাজা ইহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পাইলেন যে, ভাওয়ালের জমিদারগণ তাঁহাদিগকে নানারূপ নিষ্কর ভূমি দান করিয়া বিলক্ষণ সুখে রাখিয়াছেন, এপ্রযুক্তই তাঁহারা গর্ব্বিত হইয়া যজ্ঞে আসেন নাই। রাজা এইরূপ মর্ম্ম অবগত হইয়া ভাওয়ালের জমিদারগণকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য পদাতিক প্রেরণ করেন, পদাতিকগণ সাত আনীর জমিদারকে মাত্র পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায়। রাজা

তাহাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। পরে ঐ জমিদার অনন্যোপায় হইয়াও স্বীয় জমিদারীর ইস্তিফানামা লিখিয়া দিয়া কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন।

কিয়দ্দিন পরে নয় আনীর জমিদার বিজয় নারায়ণ রায়ও ধৃত হইয়া রাজনগর নীত হইলে, তাঁহার উপরও ঐরূপ নানাপ্রকার যন্ত্রণা পতিত হয়, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই জমিদারী ইস্তিফা দিতে স্বীকৃত হন না; রাজা তাঁহাকে বলিলেন "তোমার সমকক্ষ সাত আনী হিস্যার জমিদারও জমিদারী ইস্তিফা দিয়া গিয়াছে, অতএব তোমাকেও দিতে হইবে।" তিনি উত্তর করিলেন "সাত আনীর জমিদার যে ইস্তিফা দিয়া গিয়াছেন, একথা আমার বিশ্বাস হয়না।" রাজা তৎক্ষণাৎ সাত আনীর জমিদারের ইস্তিফানামা লইয়া তাঁহার হস্তে দিলেন, তিনি তাহা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ ইস্তিফানামা খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। রাজা এই ব্যাপার সন্দর্শনে সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন,

কিন্তু তিনি কোনক্রমেই জমিদারী ইস্তিফায় সম্মত না হইয়া এই কথা বলিলেন " মহারাজ নবাগ্নি পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ করিয়াছেন, সেই সঙ্গে বরং একটী ব্রহ্মহত্যারূপ যজ্ঞও সম্পন্ন হইবে, তথাপি আমি জমিদারী ইস্তিফা দিবনা।" রাজা তাঁহাকে কোনক্রমেই ইস্তিফানামায় সম্মত করাইতে না পারিয়া ছাড়িয়া দেন। অনন্তর তিনি বাটীতে আসিয়া জমিদারী ইস্তিফা দেওয়া প্রযুক্ত সাত আনীর জমিদারকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করত সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন ও পূর্ব্বানুরূপ জমিদারী আমল দখলে রাখিয়া ভোগ করিতে বলিয়া দিলেন। এই বৃত্তান্তটী এদেশীয় প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কতদূর সত্য বলা যায় না। সত্য হইলে বিজয়নারায়ণ রায় যে একজন অসাধারণ সাহসী ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন তাহার সংশয় থাকিতে পারে না।

বিজয়নারায়ণ রায় ও কীর্ত্তিনারায়ণ রায় বর্ত্তমানে, উদয়নারায়ণ রায় নামক এক পুত্র রাখিয়া চন্দ্রনারায়ণ রায় লোকান্তরিত হন।

তৎপ্রমাণস্বরূপ অদ্যাপিও এ পরগণার কোন২ ব্রাহ্মণের সনন্দে বিজয়নারায়ণ, কীর্ত্তিনারায়ণ ও উদয়নারায়ণ রায়ের এককালীন স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

কিয়ৎকাল পরে কনিষ্ঠ কীর্ত্তিনারায়ণ রায় ও ভ্রাতৃপুত্র উদয়নারায়ণ রায়কে রাখিয়া, বিজয় নারায়ণ রায় নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হন। কীর্ত্তিনারায়ণ ও উদয়নারায়ণ রায় একান্নে থাকিয়া একযোগে জমিদারীর শাসনাদি কার্য্য করেন। কিছু দিনান্তর উদয়নারায়ণ রায়, রাজ নারায়ণ নামক এক পুত্রকে নাবালগ অবস্থায় রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন; তখন কীর্ত্তি নারায়ণ রায় একাকী সমুদয় কার্য্যসম্পন্ন করিতে থাকেন। তৎকালীয় বিচারানুসারে বিজয়নারায়ণ রায়ের সম্পত্তির আধিপত্য ভ্রাতৃ পুত্র উদয়নারায়ণ রায়ের প্রতি না বর্ত্তিয়া ক-নিষ্ঠ ভ্রাতা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের প্রতি বর্ত্তিয়া-ছিল। কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের তিন পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ হরিনারায়ণ, মধ্যম নরনারায়ণ ও কনিষ্ঠ লোকনারায়ণ রায়। হরিনারায়ণ রায় কিশোর

কালেই কালপ্রাপ্ত হন। নরনারায়ণ রায় যখন ১১বৎসর বয়ঃক্রমের ছিলেন, তখন কীর্ত্তিনারায়ণ রায় তাহার স্ত্রীকে অষ্টম মাসের সসত্বাবস্থায় রাখিয়া ৬১ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন ; ঐ গর্ভেই লোকনারায়ণ রায়ের জন্ম হয়। কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ রায়ের আমলের শেষ ভাগে এইদেশ যবনাধিকার চ্যুত হইয়া ইংরেজ রাজত্বের অধীন হয়।

৬ষ্ঠ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ রায় চৌধুরী।

কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইলে, রাজনারায়ণ রায়ই সমুদয় কায কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার খুড়া নরনারায়ণ রায় অল্পবয়স্ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কিছু২ সাহায্য করিতেন। কীর্ত্তি নারায়ণ রায় ধার্ম্মিক, উদারচরিত, দয়ালু ও ইষ্টভক্ত ছিলেন, তাঁহার স্বভাব ভীরুতাসম্পন্ন

ছিল, কিন্তু তৎপুত্র নরনারায়ণ রায় অসাধারণ বল বিক্রমশালী, বুদ্ধিমান, দুর্দান্ত, সুশ্রী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। যখন তাঁহার পোনের যোল বৎসর বয়ঃক্রম, তৎকালে তাঁহার অধিকারস্থ সাত খামাইর গ্রামের এক কলুর স্ত্রীর প্রতি, রণভাওয়ালের অন্তর্গত বর্ম্মীর মৃজা বংশীয়দের এক জন প্রজা অত্যাচার করাতে ঐ কলুর স্ত্রী জয়দেবপুরে আসিয়া নরনারায়ণ রায়ের নিকট তদ্বিষয়ের অভিযোগ করিলে, তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া সাতআনীর জমিদারের সহিত যোগ দিয়া বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ করেন ও বর্ম্মীর মালিক মৃজা বংশীয়দের সহ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। মৃজা বংশীয়েরা পূর্ব্বেই ইহার অনুসন্ধান পাইয়া বর্ম্মীগ্রামে নিজ বাটীর চতুঃপার্শ্বে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালু ঠাকুর নামে এক মহাপরাক্রমশালী পুরুষকে সেই দুর্গের প্রথমদ্বারে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া অন্যান্য যোদ্ধাগণকে দুর্গ মধ্যে রাখিয়া ছিলেন। নরনারায়ণ রায়ের পক্ষের প্রভূত বীর্য্যসম্পন্ন প্রায় তিন শত লোক যাইয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ করে।

দুর্গের দ্বাররক্ষক কালু ঠাকুর অলৌকিক সাহস সহকারে দ্বার রক্ষা ও বিপক্ষ দলের দুর্গ প্রবেশ গতি রোধ করিতে লাগিল। দুই দিবস পর্য্যন্ত আক্রমণকারিগণ কিছুই করিতে পারিলনা বরং কালু ঠাকুরের বল বিক্রম ও সাহস দেখিয়া ভীতচিত্তে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার উপক্রম করিল। অনন্তর তাহাদের মধ্যে রামহরি গোপ নামক এদেশীয় একজন বলবান দস্যু কৌশল ক্রমে, এক রায় বাঁশ লইয়া দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে দুর্গে প্রবেশ করত কালু ঠাকুরের পৃষ্ঠে উক্ত রায়বাঁশের আঘাত করাতেই কালু ঠাকুর চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। বিপক্ষগণ মারমার করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, অনন্তর দুর্গ মধ্যে উভয় দলের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর দুর্গবাসিগণ পরাস্ত হইল ও হতাবশিষ্টেরা নানা দিকে পলায়ন করিল। দুর্গবাসিগণ মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষে ২০। ২৫ জন হত ও ৩০। ৩৫ জন আহত হয়। বিপক্ষগণ যুদ্ধে জয়ী হইলে দুইদিবসপর্য্যন্ত দুর্গলুট করিয়া চলিয়া যায়।

তদনন্তর মৃজা বংশীয়েরা নরনারায়ণ রায় প্রভৃতির নামে ঢাকায় তদ্বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত করিলে নরনারায়ণ রায় বিচারক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ঢাকায় নীত হন। ঐ মোকদ্দমার বিচার এত দীর্ঘকালে শেষ হয় যে, নরনারায়ণ রায়কে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত হাজতের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তৎপর বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

এ পরগণায় বোচাই সিকদার নামক একব্যক্তি প্রাগুক্ত কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের অতি প্রিয় ভৃত্য ছিল, তদ্ধেতু কীর্ত্তিনারায়ণ রায় তাহাকে প্রায় চারি সহস্র টাকা উপস্বত্বের ভূমি প্রদান করেন। গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী নামক আর এক ব্যক্তি তাঁহার পূজার আয়োজন ও পানার্থ ভাঙ্গ গুলিয়া দিত, এই চক্রবর্ত্তীও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহাকেও তিনি অন্যূন তিন সহস্র টাকা উপস্বত্বের ভূমি প্রদান করিয়া যান। নরনারায়ণ রায় যখন হাজতে বন্দীভাবে ছিলেন, তখন উক্ত বোচাই সিকদার ও গঙ্গারাম-চক্রবর্ত্তী এবং বলরাম-সিকদার

প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি রাজনারায়ণ রায়ের পিতৃ-
ষ্বসা অম্বিকা দেবীর সহিত এক পরামর্শে থাকিয়া
নরনারায়ণ ও লোকনারায়ণ রায়ের মাতার
খুল্লতাত ভগিনী তারিণী দেব্যা নাম্নী একটী বা-
লিকার সহিত রাজনারায়ণ রায়ের উদ্বাহ ক্রিয়া
সম্পন্ন করে। নরনারায়ণ রায় এই বিবাহে নি-
তান্ত অনিচ্ছু ছিলেন, অতএব তাঁহার অনিচ্ছা
সত্ত্বেও যাহারা এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিল, তাহা-
দের উপর তিনি অত্যন্ত কুপিত রহিলেন। অ-
নন্তর ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়া তাহাদের
প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত ক্রোধ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন; তখন বোচাই সিকদার ও বলরাম
সিকদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শত্রু দমন জন্যই হ-
উক বা কোন লাভের জন্যই হউক, রাজনারায়ণ
রায়ের পিতৃষ্বসা অম্বিকা দেবীর সহিত এই প-
রামর্শ করিল যে, নরনারায়ণ রায় এত অল্প বয়-
সেই যেরূপ প্রবল পরাক্রমশালী হইয়াছেন,
বয়োবৃদ্ধি হইলে তিনি রাজনারায়ণ রায়কে এ-
কেবারে উৎসন্ন করিয়া দিবেন, অতএব যেরূপে
হউক তাঁহার বিনাশ সাধন করা কর্ত্তব্য। ফলে

রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ রায়ের অত্যন্ত প্র-
ণয়ভাব ছিল। দুরাত্মাগণের এইরূপ পরামর্শ
স্থির হইলে একদা নারায়ণ সিকদারের বাটীতে
ভোজনার্থ নরনারায়ণ রায়কে তাহারা বিনীত
ভাবে নানাপ্রকার তোষামোদ ও প্ররোচন বাক্য
বলাতে তিনি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং ত-
দনুসারে কয়েকজন পাচক ব্রাহ্মণকেও তথায়
প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তিনি স্নান পূজা সমা-
পন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে, পামরগণ বিষ
মিশ্রিত সন্দেশ প্রভৃতি নানা প্রকার জলপানীয়
সামগ্রী তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করত নানা বিন-
য়ানুরোধ বাক্যে তাহা ভক্ষণ করাইল। কিঞ্চিৎ
কাল পরই তাঁহার শরীর বিকল ও অস্থির
হইতে লাগিল; ভয়ানক বিষের জ্বালাতে শরীর
ছট্ ফট্ ও প্রাণ ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। তখন
দুরাত্মাগণ তাঁহাকে বিষমিশ্রিত জলপানীয় আ-
হার করাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহা সকলের
নিকট ব্যক্ত করেন এবং এখনই আমাকে এই
প্রপঞ্চময় সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে এই
বলিয়া তথা হইতে বাটীতে প্রতিগমন করিলেন,

বাটীতে আসিয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই নিদারুণ বিষযন্ত্রণায় তনুত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়েস একুশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

কিয়ৎ কাল পরে নরনারায়ণ রায়ের এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ ও তাঁহাকে বিষ ভক্ষণ করাইবার আমূল বৃত্তান্ত রাজনারায়ণ রায়ের কর্ণ গোচর হইলে, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও কুপিত হইয়া বোচাই ও বলরাম সিকদারকে আনয়ন করত বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং প্রতিদিন প্রহারাদি নানা প্রকার বিষম যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃস্বসাও যে এই শোচনীয় দুষ্কর্ম্মে সংলিপ্তা ছিলেন, একথা তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল না। বোচাই ও নারায়ণ সিকদারকে প্রায় মাসৈক পর্য্যন্ত উক্তরূপ যন্ত্রণা দেওয়ার পর একদা তাঁহার পিতৃস্বসা তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি বোচাই ও নারায়ণকে আর এরূপ ক্লেশ দিওনা, তাহারা যে এরূপ কার্য্য করিয়াছে এমত আমার বোধহয়না, আর করিয়া থাকিলেও তোমার মঙ্গলের জন্যই করিয়াছে। এই কথা

শুনিবামাত্র রাজনারায়ণ রায় ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিলেন, আপনিও যে ঐ দুষ্কর্ম্মে লিপ্তা ছিলেন, তাহাতে আমার যে কিছু সন্দেহ ছিল, এইক্ষণ তাহা একবারে দূর হইল। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, আপনার মন্ত্রণামতেই এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভয়ানক গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আমি আর আপনার মুখ দর্শন করিবনা, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে কাশীধামে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর তিনি কতিপয় বৎসর নির্ব্বিঘ্নে জমিদারীর কার্য্য সম্পাদন করেন, পরে নাবালগ পিতৃব্য লোকনারায়ণ রায়ের বিবাহের প্রস্তাব ও সম্বন্ধ সুস্থির করত তৎকার্য্য সম্পন্ন না হইতে হইতেই তিনি নিঃসন্তান সহধর্ম্মিণী তারিণী দেব্যা ও পিতৃব্য লোকনারায়ণ রায়কে রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

এই সময়েও ভাওয়ালে হিংস্র জন্তুর উপদ্রবে লোক সকল সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জয়দেবপুর গ্রামে ব্যাঘ্রের এত প্রাদুর্ভাব ছিল

যে গৃহ হইতে ব্যাঘ্রে মানুষ লইয়া যাইত। কোন গৃহের ভিত্তি ভগ্ন থাকিলে ব্যাঘ্র সেই ভগ্ন ভিত্তি দ্বারা প্রবেশ না করিয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিত, সেইহেতু তৎকালীয় লোকে ঐ ব্যাঘ্রকে দুয়ারী বাঘিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। উক্ত প্রকারে ব্যাঘ্র দুই এক জন লোক নষ্ট না করিত, এমত রাত্রি প্রায় ছিল না। ঐকালে ভাওয়ালে কতকগুলি ফকীর এরূপ ছিল যে তাহারা ভিক্ষা করিতে আসিলে, যদি তাহাদিগকে কেহ তাহাদের সন্তুষ্টিজনক ভিক্ষা না দিত, তাহা হইলে তাহারা এই উক্তি করিত যে আমাদিগকে উপযুক্ত ভিক্ষা না দেওয়ার প্রতিফল অদ্য রাত্রেই প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের বাক্য ভঙ্গিতে তৎকালের লোকে এই বিশ্বাস করিত যে, তাহারাই মন্ত্রপ্রভাবে ব্যাঘ্রকে চালান দিয়া লোকালয়ে প্রেরণ করে। একেত ব্যাঘ্রের ভয়ে লোক সকল সর্ব্বদা শশব্যস্ত, তাহাতে আবার ফকীরদিগের এইরূপ উপদ্রব, ভূম্যধিকারিগণ কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। অতঃপর যদি কোন ফকী-

রের উল্লিখিতরূপ উক্তির পর কোন বাড়ীতে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইত, তাহাহইলে ভূম্যধিকারীরা সেই ফকীরকে ধরিয়া আনিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিতেন। এবম্প্রকারে পাঁচ সাত জন ফকীরের প্রাণদণ্ড করার পর আর কোন ফকীরই ঐরূপ উক্তি করিত না। ঐ ফকীরেরা আপনাদিগকে বাঘুয়া (ব্যাঘ্রচালক) ফকীর বলিয়া পরিচয় দিত।

রাজনারায়ণ রায় হিংস্রজন্তুর উপদ্রবে নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া বন্দুক ছুড়িয়া ও তীর পাতিয়া ব্যাঘ্র হননকরা অভ্যাস করেন এবং পূরণীয়াজিলা প্রভৃতি স্থানহইতে বহু অন্বেষণ পূর্ব্বক বাঘমার ইত্যাদি নানা রকমের শিকারী আনাইয়া স্বয়ং তাহাদের সহিত শিকারে প্রবৃত্ত হন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষপ্রভৃতি বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তুর বিনাশসাধন করেন। ঐ সময়ে নীলমণি বাঘমারা নামক একব্যক্তি বিষাক্ত তীর পাতিয়া অতি বৃহৎকায়া একটী বাঘিনীর প্রাণ সংহার করে, ঐ বাঘিনীর কপালে লোম ছিল না, ইহাতে তৎকালীয় লোকে সেই বাঘিনীকেই দুয়ার ঠেলিতেই ক-

পালের লোম উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া দুয়ারী বাঘিনী ব্যাখ্যা করিয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ বাঘিনীর বিনাশের পর আর প্রাগুক্তরূপ দ্বারভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্র ঘরে যাইতনা, ইহাতেও কেহ২ ঐ বাঘিনীকেই দুয়ারীবাঘিনী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত ইন্দ্রেশ্বর শিবালয়ের পশ্চিমাংশে, লড়ান পলান নামক এক ব্যক্তি ধান্যাদি শস্য লট্‌কাইয়া বন্দুকের কল পাতিয়া দুইটী অরণ্য হস্তীর প্রাণসংহার করে, হস্তীদ্বয় বন্দুকের গুলী খাইয়া যে স্থানে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এখনও লোকে সেই স্থানকে "হাতী মারারটেক" বলে।

রাজনারায়ণ রায় এইরূপ যান্ত্রিক হইয়া ভাওয়ালের বহুসংখ্যক হিংস্র প্রাণীর বিনাশ সাধন করেন বটে, কিন্তু তাহাতেই যে এই ভাওয়াল ভয়শূন্য স্থান হইয়াছিল এমত নহে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছিল এইমাত্র। রাজনারায়ণ রায়ের পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আর কেহই স্বহস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া হিংস্র জন্তু-বিনাশের এতদূর উদ্যোগী হন নাই।

৭ম, লোকনারায়ণ রায় চৌধুরী।

রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার পিতৃব্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকনারায়ণ রায়ের হস্তে জমিদারীর কর্ত্তৃত্বভার পতিত হয়। লোকনারায়ণ রায় যদিও অল্প-বয়স্ক ছিলেন, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত অতীব সুশৃঙ্খলরূপে জমিদারী সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে (১১৯৪ সনে) দুর্ভিক্ষ হওয়াপ্রযুক্ত উত্তরস্থ পাহাড় কামাক্ষা দ্রোমের নিকট ও কুচবেহার হইতে বহুসংখ্যক অসভ্য-কোচ ও রাজবংশী জাতীয় লোক এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন লোকনারায়ণ রায় ও সাত আনী হিস্যার মালিক জমিদার গাছা নিবাসী কৃষ্ণানন্দ রায় উভয়ে একবাক্য হইয়া সোৎসাহচিত্তে ঐ আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে নয় আনী ও সাত আনীতে কতক স্থান নিষ্কর দিয়া স্থাপন করিলেন, উহারা বন্দুকাদি অস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিল। উহারা উল্লিখিতরূপে ভাওয়ালে স্থিত হইয়া নানা কৌশলে

ভাওয়ালের হিংস্র জন্তুর বিনাশ সাধনে যাজ্ঞিক হয় ও বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু বিনষ্ট করিয়া নানা স্থানের ভয় নিবারণ করে। বংশী জাতীয়েরা হিংস্র জন্তু নিধনার্থ নানাবিধ কৌশল প্রকাশ করিত। তাহারা কোন২ স্থানে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তদুপরি কৌশলক্রমে মৃত্তিকার লেপদিয়া ও ঘাস বিছাইয়া রাখিত, পরে হস্তী মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ তাহার উপর দিয়া দৌড়াইয়া চলিলেই অমনি গর্ত্তে পতিত হইয়া আবদ্ধ হইত; তৎপর বংশিগণ যাইয়া ঐ সকলের প্রাণ সংহার করিত। এবংবিধ নানা-প্রকার কৌশলে তাহারা ভয়সঙ্কুল ভাওয়ালের অনেক স্থান অপেক্ষাকৃত ভয়শূন্য করিয়া লোক-বসতির উপযুক্ত করিয়া তোলে। এই সময়েই ভাওয়ালে কিছু২ করিয়া লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল; কোচ ও বংশী জাতীয়দিগের মধ্যে অদ্যাপি কেহ২ পূর্ব্ব নিয়মমতে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছে।

লোকনারায়ণ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১১৯৮ সনে লোকনারায়ণ শর্ম্মা চৌধুরী ও কৃষ্ণশ্যাম-

কিশোর চৌধুরী নামে ২৫১৬০ টাকা সিক্কাতে ভাওয়াল সম্বন্ধে দশদশালা বন্দোবস্ত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উভয় ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের সময়ে ভাওয়াল নয়আনি ও সাত আনী বন্টক মতে দখল ছিল; ১২০১ সনে নয় আনা ৯ নম্বর মহাল ১১৭৭৪ টাকা সিক্কাতে লোক নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে ও সাত আনী ১০ নম্বর মহাল ১৩৩৮৬ টাকা সিক্কাতে কৃষ্ণ শ্যাম কিশোর রায় চৌধুরীর নামে পৃথক তাহুত হয়।

এই সময়ে ভাওয়ালের পশ্চিম তুরাক নদীর অপর পারস্থ কাশীমপুর পরগণার জমিদার গৌরীপ্রসাদ রায় নামক এক ব্যক্তি প্রবলপ্রতাপশালী ছিলেন, তৎকালে ভাওয়ালের লোক তুরাক নদীর পশ্চিমপারে কাশীমপুর পরগণায় গেলে, কাশীমপুরের লোকে তাহাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিত। বারংবার এইরূপ হওয়ার পর ভাওয়ালের নয় আনী ও সাত আনির জমিদারগণ কাশীমপুরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, উভয়ে এক যোগে লোক সংগ্রহ করত উক্ত গৌরীপ্রসাদ রায়ের সহ বিবাদে

প্রবৃত্ত হন। তখন গৌরীপ্রসাদ রায়ও লোক সং-
গ্রহ পূর্ব্বক স্বয়ং এক লালডিঙ্গী আরোহণ
করিয়া তাঁহাদের সহিত দাঙ্গা করিতে আসেন।
দাঙ্গা উপস্থিত হইলে ভাওয়ালের লোক জয়ী
হইল ও গৌরীপ্রসাদ রায়ের লালডিঙ্গী লুঠ ও
ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে বিস্তর অপমান করে।
অতঃপর গৌরীপ্রসাদ রায় ভাওয়ালের
জমিদারগণের সহিত সন্ধি করিয়া মৈত্রীভাব অ-
বলম্বন করত বিবাদ শান্তি করেন। এই হই-
তেই ভাওয়ালের লোকের কাশীমপুরে যাতায়া-
তের আর কোন বিঘ্ন হইত না।

লোকনারায়ণ রায়ের প্রথমাবস্থায় ভাওয়ালে
আর একপ্রকার চমৎকার দস্যুবৃত্তি আরম্ভ হয়।
কতকগুলি অপরিচিত মুসলমান, ফকীরের বেশ
ধারণ করিয়া মলঙ্গী নাম প্রকাশ করত ভিক্ষা
উপলক্ষে ভাওয়ালে আইসে এবং নানা প্রকার
অত্যাচার ও সুযোগক্রমে লুঠ আরম্ভ করে।
তাহাদের দৌরাত্ম্যে ভাওয়ালের অনেক লোক
পলায়ন করিয়া কাশীমপুরের উত্তরে যশুরণ
নামক অরণ্যময় স্থানে গিয়া লুক্কায়িত ভাবে

প্রবৃত্ত হন। তখন গৌরীপ্রসাদ রায়ও লোক সং-গ্রহ পূর্ব্বক স্বয়ং এক লালডিঙ্গী আরোহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত দাঙ্গা করিতে আসেন। দাঙ্গা উপস্থিত হইলে ভাওয়ালের লোক জয়ী হইল ও গৌরীপ্রসাদ রায়ের লালডিঙ্গী লুঠ ও ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে বিস্তর অপমান করে। অতঃপর গৌরীপ্রসাদ রায় ভাওয়ালের জমিদারগণের সহিত সন্ধি করিয়া মৈত্রীভাব অ-বলম্বন করত বিবাদ শান্তি করেন। এই হই-তেই ভাওয়ালের লোকের কাশীমপুরে যাতায়া-তের আর কোন বিঘ্ন হইত না।

লোকনারায়ণ রায়ের প্রথমাবস্থায় ভাওয়ালে আর একপ্রকার চমৎকার দস্যুবৃত্তি আরম্ভ হয়। কতকগুলি অপরিচিত মুসলমান, ফকীরের বেশ ধারণ করিয়া মলঙ্গী নাম প্রকাশ করত ভিক্ষা উপলক্ষে ভাওয়ালে আইসে এবং নানা প্রকার অত্যাচার ও সুযোগক্রমে লুঠ আরম্ভ করে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে ভাওয়ালের অনেক লোক পলায়ন করিয়া কাশীমপুরের উত্তরে যশুরণ নামক অরণ্যময় স্থানে গিয়া লুক্কায়িত ভাবে

বাস করে। ঐ দুরাত্মা মলঙ্গিগণ শীতকালে আসিয়া এক কি দুই মাস পর্য্যন্ত থাকিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিত। দুই তিনবার এবম্প্রকার অত্যাচার করার পর উক্ত সংবাদ রাজপুরুষ দের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহাদের কর্ত্তৃক থানা ইত্যাদি স্থাপিত হইয়া ঐ দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। উক্ত মলঙ্গিগণ কোথা হইতে আসিত, কোথায় থাকিত ও পরে কোথায় চলিয়া যাইত তাহা কেহই নিশ্চয় করিতে পারিত না।

ভাওয়াল পরগণার ৯ নং জমিদারীভুক্ত বান্দাখোলা নামক প্রাচীন এক গ্রাম আছে। তাহাতে কতকগুলি চণ্ডাল জাতীয় লোক বাস করিত। পূর্ব্বকালে ঐ চণ্ডালগণ নবাবসরকারে মাঝী মাল্লার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। উহারা সকলে একবাক্য হইয়া বান্দাখোলা নবাবি জায়গীর বলিয়া নবাব সরকারে প্রকাশ করে এবং বলে যে নবাব সরকারের সাহায্য পাইলে জমিদারকে বেদখল করিতে পারে, তাহাদের এই বাক্যে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সাহায্য করণাশয়ে তাহাদিগের সঙ্গে কতকগুলি

লোক বান্দাখোলা অধিকারজন্য প্রেরণ করেন। এই সংবাদ লোকনারায়ণ রায়ের কর্ণ গোচর হইলে তিনি সাত আনীর ভূম্যধিকারীর সহিত এক যোগ হইয়া ভাওয়ালস্থ কোচ, বংশী এবং চৈরা ও ঈশ্বরপুরগ্রামের সরদারগণকে আনাইয়া নবাবের প্রেরিত লোকদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঐ যুদ্ধ সময়ে অত্যন্ত বল বীর্য্য সম্পন্ন বিপুল সাহসী উচিতরাম নামক একজন বংশীর প্রভূত কৌশল ও বিক্রমে, নবাবের লোক সকল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়েই লোকনারায়ণ রায় সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পাণিগ্রহণ করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই ১২০১ সনের ভাদ্রমাসে লোকনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী উক্ত সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর গর্ভে গোলোকনারায়ণ রায়ের জন্ম হয়। গোলোক নারায়ণ রায়ের ৩ মাস বয়ঃক্রমকালে লোক নারায়ণ রায় পরলোক যাত্রা করেন।

প্রবাদ আছে উক্ত লোকনারায়ণ রায় চৌধুরীর আমলে ১১৯৪ অব্দে এতদঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন নয় আনীর

প্রজা জাঝর নিবাসী সীতারাম রাহা নামক এক ব্যক্তি অতি প্রধান কৃষক ছিল, তাহার বিস্তর ধান্য জমা ছিল সে ভাওয়ালের প্রজা-দিগকে উচিত মূল্যে ধান্য দিয়া প্রাণ রক্ষা করে। লোক নারায়ণ রায় এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে সীতারামকে তাহার নিজ বসত গ্রামে জাঝর তালুক করিয়া দেন এবং তাহার প্রার্থনা মতে, উৎসাহ ও উক্ত সৎকা-র্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অল্প দিবসের জন্য তাহাকে এক নায়েবী কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

৮ ম. সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী।

লোক নারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী নাবালগ পুত্র গোলোকনারায়ণ রায়কে লইয়া নিতান্ত ক্লেশে পতিতা হন। ঐ সময়ে তাঁহার জমিদারীতে কোর্ট অব ওয়ার্ড আফিসের নারায়ণদাস বাবু নামক এক ব্যক্তি সরবরাহকার নিযুক্ত হন। তৎকালে প্রাগুক্ত রাজনারায়ণ রায়ের স্ত্রী

তারিণী দেব্যা চৌধুরাণীকে কতিপয় দুষ্ট ব্যক্তি নানারূপ কুমন্ত্রণা দ্বারা পৃথক করাইয়া জমিদারীর তিন আনী হিস্যা তাঁহাকে দখল দেওয়ায়। চান্দহর নিবাসী রাজনারায়ণ হোড়, ভাওয়ালস্থ বাড়ীয়া গ্রাম নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় মজুমদার ও শ্রীহট্ট জিলার অন্তঃপাতী বাণিয়াচঙ্গ গ্রাম নিবাসী পূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এই তিন ব্যক্তিই উক্ত কুমন্ত্রণার প্রধান মন্ত্রী ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত নরনারায়ণ রায় যখন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তখন এই ব্যক্তি নানারূপ মন্ত্রণা দিয়া রাজনারায়ণ রায়কে কুলগুরু ত্যাগ করাইয়া স্বয়ং মন্ত্র প্রদান করত ঐ বংশের গুরু হন। ইহার পূর্ব্বে এই বংশে আর কখনও কাহাকে গুরুত্যাগী অথবা পৃথক হইতে শ্রুত হওয়া যায় নাই। ঐ দুষ্টগণ উক্ত নারায়ণদাস বাবুর সহিত একযোগ হইয়া একেবারে ভাওয়াল উৎসন্ন করিবার উদ্যোগী হয়; এমন কি এখনও ভাওয়ালের লোকে নারায়ণ দাসী একটা ধুম হওয়ার কথা বলিয়া থাকে।

ঐ দুরাত্মাগণ উক্ত নারায়ণদাস বাবু সর-বরাহকার হইতে ক্রোকী মহাল ইজারা লইয়া সমুদয় ॥/০ আনীর প্রজাগণকে প্রায় একবাক্য ও বশীভূত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণীর গ্রাসাচ্ছাদনও প্রায় বন্ধ করার উপক্রম করিয়াছিল। উক্তা চৌধুরাণী নাবালগ পুত্র গোলোক নারায়ণ রায়ের সহিত প্রজার বাটীতে২ যাইয়া আহার পর্য্যন্ত পাইতেন না এবং কোন২ প্রজা এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত যে তাহাদের বাটীতে গেলে তাঁহাকে দিনেক দুইদিন থাকিবার স্থানও দিত না।

ঐ সময়ে উক্ত রাজনারায়ণ হোড় ও পূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি পরামর্শ করিয়া তারিণী দেব্যাকে একটী পোষ্য পুত্র রাখিতে মন্ত্রণা দেয় ও উদ্যোগ করে। তদনুসারে মহেশ্বরদী পরগণাস্থ গোতাসীয়া নিবাসী দামোদর চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণের একটী পুত্র আনীত হয়। শুনা আছে ঐ বালকটিকে যখন জয়দেবপুরে লইয়া আসে তখন সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী তাহা জানিতে

পারিয়া তন্নিবারণের অন্য কোন উপায় অব লম্বনের পন্থা না দেখিয়া ভর্ত্তৃকুল প্রতিষ্ঠিত দেবতা ঠাকুর মাধবের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে আত্ম জ্ঞাতিবংশজ ও পূর্ব্বের প্রধান চাকর দুর্গারাম দেওয়াঞ্জীর পুত্র কাশীনাথ দেওয়াঞ্জী এবং নায়েব বংশ চাউকা নিবাসী শ্যাম রায় এবং সীকদার বংশকে তত্ত্ব দিয়া আনিয়া রাখেন। অনন্তর তারিণী দেব্যার পক্ষীয় লোকেরা ঐ পোষ্য পুত্র লইয়া মাধব বাটীর দক্ষিণ দিকে আসিলে পর, সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পক্ষীয়েরা কেবল ইষ্টকের ঢিল ছুড়িয়াই তাহাদিগকে জয়দেবপুর হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। পরে তারিণী দেব্যা চৌধুরাণী জয়দেবপুরে থাকিয়া কোনক্রমে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারায় ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করত পূবাইল গ্রামে যাইয়া এক বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন; ঐ পুত্রের নাম দেবনারায়ণ রায় রাখা হয়। ঐ সময়ে তারিণী দেব্যার নাম এমত বিখ্যাত হইয়াছিল যে ভাওয়ালে তাঁহার নাম ব্যতীত

সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার কি তাঁহার নাবালগ পুত্রের নাম কিছুমাত্র খ্যাত ছিল না। যে কয়জন লোক সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার অনুগত ছিল, তারিণী দেব্যার লোকে তাহাদের কাহাকে পাইলেই ধৃত করিয়া পূবাইল নিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দিত। ঐ সময়ে সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পক্ষে তাঁহার জ্ঞাতি শ্যাম রায়, রাজীব রায়ের বংশধর রামশঙ্কর রায়, কার্ত্তিক রায়, দেওয়ান কাশী-নাথ বিশ্বাস, চাউকা নিবাসী শ্যামরায়, রাম মাণিক্য রায়, বাড়ীয়া নিবাসী রামদয়াল ঘোষ, জয়নাথ ঘোষ; পলাসোনা নিবাসী কৃষ্ণ চ-ক্রবর্ত্তী, রামমোহন চক্রবর্ত্তী; জয়দেবপুর নিবাসী শীকদারগণ, বান্দাখোলা নিবাসী সী-তারাম কৈবর্ত্ত, চান্দনা নিবাসী চণ্ডাল জাতীয় সানা উপাধিপ্রাপ্ত প্রাচীন নফরগণের মধ্যে ৫। ৭ জন, ইটাহাটা নিবাসী গোপ জাতীয় চান্দ মহিষাণ কানু মহিষাণ এবং সোনাতন দাস মণ্ডল ও দাণ্ডদাস মণ্ডল এইমাত্র লোক ছিল। সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা কেবল তাহাদের সা-হায্যেই অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ক্লেশে

কাল যাপন করিতেন। ঐ সময়ে নাবালগ গোলোকনারায়ণ রায়ের উছী রামশঙ্কর রায়ের নামীয় ওছায়েতনামা উপস্থিত করিয়া রাজ পুরুষদের গোচর করিলে তাহা প্রমাণিত হইয়া তাঁহার বিত্ত ক্রোক হইতে মুক্ত হওত উছীর জিম্মা হয়, তৎপ্রযুক্তই সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার গ্রাসাচ্ছাদনের অপেক্ষাকৃত সদুপায় হইয়া উঠে।

ঐ সময়ে পলাসোনা গ্রামের ঘোষ বংশ মধ্যে সূর্য্যনারায়ণ রায় ভাওয়ালের ।।/০ আনী জমিদারী মধ্যে ৵০ আনী তাঁহাদের বলিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত বান্দাখোলা নিবাসী চণ্ডালবর্গ যে বান্দাখোলা নবাবী জায়গীর বলিয়া এক আপত্তি করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এতদুভয় মোকদ্দমাই অতি ভয়ানক হইয়া উঠে। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা, স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ও তাঁহার হুজুরি আমলা রামদয়াল ঘোষের পরামর্শ মতে উক্ত উভয় মোকদ্দমারই বিলক্ষণ যোগাড় চলিতে থাকে। তখন গো-

লোকনারায়ণ রায়ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত রামদয়াল ঘোষের চেষ্টা ও উদ্যোগে উভয় মোকদ্দমাই ১২২৪ সনে সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পক্ষে জয় হয়। ঐ সময়েই তারিণী দেব্যা যে অনিয়মে অর্থাৎ অনুমতি পত্রাদি ভিন্ন দেবনারায়ণ রায়কে পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধেও আর একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এত দীর্ঘকালে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল যে, উক্ত দেবনারায়ণ রায়ের নাবালগাবস্থাবধি মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর পর নিষ্পত্তি হয়। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তারিণী দেব্যা চৌধুরাণীর সহিত দেবনারায়ণ রায়ের ঘোরতর মনোবাদ জন্মিবাতে, দেবনারায়ণ রায় তারিণী দেব্যাকে পূবাইল হইতে তাড়াইয়া দেন। তারিণী দেব্যা অনন্যগতি হইয়া পুনরায় জয়দেবপুর আসিয়া দেবর গোলোকনারায়ণ রায় ও শ্বশ্রূ সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে উল্লিখিত রামদয়াল ঘোষের যথোচিত তত্ত্ব তালাফিতে ঐ মোকদ্দমায় দেবনারায়ণ রায় পোষ্য

পুত্র নামঞ্জুর হন। সুতরাং তিনি অনন্যোপায় হইয়া সপরিবারে স্বীয় শ্বশুরালয় পোড়াগাছা যাইয়া শ্বশুর বংশীয় দীঘাল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ সহ বাস করেন। এই সময়েই গোলোকনারায়ণ রায়ের প্রথম পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। এই বংশেতে প্রথম পুরুষ হইতে এ পর্য্যন্ত পোষ্য রাখা হয় নাই, মাত্র দেবনারায়ণ রায়কে পোষ্য রাখা হয়, তাহাও নিয়ম বিরুদ্ধ হওয়াতে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ ১২৩২ সনে তারিণী দেব্যা চৌধুরাণী কালগ্রাসে পতিতা হইলে তাঁহার স্বামির জমিদারীর অংশ ৵০ আনীও গোলোকনারায়ণ রায় প্রাপ্ত হন। এই অল্পকালমাত্র ৷৷৵০ আনী হইতে ৵০ আনী পৃথক্ ছিল, এতদ্ভিন্ন আর কখনও ৷৷৵০ আনী হইতে কোন অংশ পৃথক্ হয় নাই।

সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণীর আমলে ভাওয়ালের ১০ নং জমিদারীর অর্থাৎ ।৵০ আনী অংশের আংশিক জমিদার কালীপ্রসাদ রায় ... কালীকিশোর রায় চৌধুরী ঋণ

তৎকালীন প্রসিদ্ধ নীলকর জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের নিকট বিক্রয় করেন, উক্ত সাহেব কৌশলক্রমে ।৴০ আনীর অন্যান্য জমিদার হইতেও কতক অংশ ক্রয় করিয়া মুদাফা নামক স্থানে সদর কাচারী এবং জয়দেবপুরের পশ্চিমাংশে ভারারিয়া নামক টেকে দ্বিতীয় কাচারী স্থাপন করত ।।৴০ আনীর জমি সমস্ত বলপূর্ব্বক দখল ও প্রজাগণকে আপন এলাকায় নেওয়ার মানসে নানা প্রকার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত করেন। ১২৪৩ সনে ।৴০ আনীর অংশ খরিদ করিয়া ১২৪৫ সনের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এমত ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন যে, ॥৴০ আনীর প্রজা ও জমিদার কেহই সুস্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন না। প্রায়ই ।।৴০ আনীর জমি হইতে ধান্যাদি শস্য বলপূর্ব্বক কাটিয়া নেওয়া, ।।৴০ আনীর প্রজাগণের বাটী লুঠপাট করা ও অন্যায়রূপে প্রজাগণকে মারপীট ইত্যাদি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোলোকনারায়ণ রায়ের পুত্র কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর বয়ঃপ্রাপ্ত-

বস্থা। সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা ও কালীনারায়ণ রায় ঐ সমস্ত অত্যাচার অসহ্য জ্ঞান করিয়া ও প্রজাদের ক্লেশ দেখিয়া তন্নিবারণের নানা প্রকার আয়োজন, উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী এই সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ দৃষ্টে ও মন্ত্রণা শ্রবণে একান্ত ভীত হইয়া ভাওয়াল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন মানসে মুরসিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। ঐ মহাপুরুষ জন্মাবচ্ছিন্নেও কোন ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি সংসারের প্রতি একেবারেই নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি ভগবান বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং সময়ে২ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনের বেশে দেশ পর্য্যটনে গমনোদ্যোগী হইতেন, কেবল তাঁহার মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী নানাপ্রকার যত্ন ও কৌশলে তাঁহাকে বিরত করিতেন। একবার তিনি সন্ন্যাসীবেশে গোপন ভাবে, কামাক্ষা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা বহু অন্বেষণ পূর্ব্বক তত্ত্ব পাইয়া তথা হইতে আনয়ন করেন।

১২৪৫ সনের কার্ত্তিক মাস হইতে ওয়াইজ সাহেবের সহিত ভয়ানক বাদানুবাদের সূত্রপাত হয় এবং উভয়পক্ষই তাহার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পক্ষে ঢাকার পূরাণনাকাস নিবাসী ভগীরথ পাঠক নামক এক ব্যক্তি বিপুল পরাক্রমশালী ডন্‌গার ছিল; সেই এই পক্ষের প্রধান যোদ্ধা এবং ওয়াইজ সাহেবের পক্ষে পাঞ্জু সরদার নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও সাহসী ছিল, সে যুদ্ধের নানাপ্রকার কল কৌশল জানিত, সেই তৎপক্ষের প্রধান যোদ্ধা ছিল। ঐ পাঞ্জু সরদার ওয়াইজ সাহেবের পক্ষীয় বহু সংখ্যক লোক সহ পূর্ব্বোক্ত ভারারিয়া নামক স্থানের কাচারীতে নিযুক্ত ছিল, সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পক্ষেও জয়দেবপুরে বহু সংখ্যক কোচ, বংশী ও অন্যান্য পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণ সংগ্রহ করিয়া উল্লিখিত ভগীরথ পাঠক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। ঐ সময়ে সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা ও কালীনারায়ণ রায় আপন পক্ষে পণ্টন তেওয়ারী নামক হিন্দুস্থানীয় একব্যক্তিকে নায়েব

সনন্দ প্রদান করত সপরিবারে জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিয়া ঢাকার বাসা বাটীতে যাইয়া বাস করেন। সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার কর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ২ এমত পরামর্শ দিয়াছিলেন যে "ওয়াইজ সাহেব যেমন ৷৷/০ আনী প্রজার প্রতি অত্যাচার করেন আমরাও ৷৵০ আনীর প্রজার প্রতি তদ্রূপ অত্যাচার করিতে থাকি" কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা ঐ পরামর্শে অসম্মতা হইয়া কহিলেন যে "প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, অতএব তাহা কখনই করিব না; দুরাত্মার দৌরাত্ম্য নিবারণ পূর্ব্বক প্রজার সুখ সম্পাদন করাই উচিত কল্প, আমি তাহাই করিব।" অনন্তর উভয় পক্ষের ভয়ানক যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া তৎকালীন ঢাকার মাজিষ্ট্রেট গ্রেণ্ট সাহেব টঙ্গী ও কাপাশীয়ার থানাতে শান্তিরক্ষার জন্য অনেক পুলিষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখেন। (তৎকালে কুক্ সাহেব ঢাকার জজ ছিলেন।)

১২৪৫ সনের ২৬ শে অগ্রহায়ণ প্রত্যূষে উল্লিখিত ভারারিয়া কাচারীর পাঞ্জু সরদার

প্রভৃতি ওয়াইজ সাহেবের পক্ষীয় বহু সংখ্যক লোক, জয়দেবপুর লুঠ করা ও মাধবের মন্দির ভগ্ন করা ইত্যাদিসূচক সিংহনাদ করিয়া জয়-দেবপুরাভিমুখে গমনোদ্যোগী হইল। এদিগে ভগীরথ পাঠক প্রভৃতি ঐ সিংহনাদ শ্রবণে সংগৃহীত কোচ বংশী প্রভৃতি প্রভূত পরাক্রম শালী ব্যক্তিগণ সহ যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া ভা-রারিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। ভারারিয়ার কাচারীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিখারখান আন্ধী না-মক পুষ্করিণীর উত্তর দিকের মাঠের মধ্যে উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইলে, তথায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ঐ সময়ে ভগীরথ পাঠক হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় ছিল, পাঞ্জু সরদার মৃত্তিকায় থাকি য়াই তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লা-গিল। হঠাৎ পাঞ্জুর পক্ষীয় একজনের একটা বন্দুকের গুলি ভগীরথ পাঠকের হস্তীর নিকট দিয়া যাওয়াতে তাহার হস্তী আর কোনক্রমেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। তখন ভগীরথ হস্তী পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পাঞ্জুর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই পাঞ্জু

ভগীরথের প্রতাপ সহ্য করিতে নাপারিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পবনবেগে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। পাঞ্জুকে পলায়মান দেখিয়া তৎপক্ষের সমুদয় লোক ছত্রভঙ্গ হইয়া পশ্চা-দ্দিগে দৌড়িল, তখন ভগীরথের পক্ষীয় লোকে ভারারিয়ার কাচারী চড়াউ করিয়া ঐ কাচারীর কর্ম্মচারী রামকৃষ্ণ হোড়কে ও তৎসঙ্গীয় কয়েক জন সরদারকে ধৃত করিয়া কাচারী লুঠ পাট করিল। পাঞ্জু সরদারকে ধরিবার মানসে ভগী-রথ পাঠক বহুতর লোকসহ পশ্চিম দক্ষিণদিকে দ্রুতবেগে গমন করে। ভারারিয়া হইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর ছয়দানা নামক স্থানের নিকট একটী ক্ষুদ্র ঝোড়ের অভ্যন্তরে পাঞ্জু এই মানসে লুকায়িত ছিল যে, ভগীরথ লোকসহ তাহাকে পশ্চাৎ করিয়া গেলে পরে সে গুপ্তভাবে যাইয়া তাহার পশ্চাৎদিয়া আক্রমণ করিবে, কিন্তু ভ-গীরথ ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, একটী স্ত্রী লোক পাঞ্জুর লুক্কায়ন সংবাদ ভগীরথের পক্ষীয় একজন লোকের নিকট বলিয়া দেয়, ভগীরথ তদনুসারে ঐ ঝোড় অন্বেষণ করিয়া পাঞ্জুর

সাক্ষাৎ পায় এবং তথায় পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করে ঐ যুদ্ধে পাঞ্জু পরাস্ত হইয়া ভগীরথের হস্তে ধরা পড়ে। তখন ভগীরথ তাহাকে বাম কক্ষতলে ফেলিয়া সজোরে একটী চাপ দেওয়াতেই পাঞ্জুর নাঁক মুখ দিয়া রক্ত বহির্গত হয়; ভগীরথ তাহা দেখিয়া তাহাকে দুর্ব্বল বিবেচনায় তাচ্ছিল্যক্রমে আর স্পর্শও করিল না। অন্যান্য লোকে পাঞ্জুকে ধৃত করিয়া লয়। তৎপর তথা হইতে ওয়াইজ সাহেবের ভাঁওয়ালের সদর কাছারী পূর্ব্বোক্ত মুদাফা অভিমুখে যাত্রা করে। তৎকালে ঐ কাচারীতে কেমরেল সাহেব নামক একজন ইংরাজ ওয়াইজ সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী, রামলোচন নন্দী নামক একজন নায়েব এবং আর কতকগুলি লাঠিয়ালও তথায় ছিল। রামলোচন নন্দী ক্ষৌরী হইতে বসিয়াছিলেন, অর্দ্ধ শিরো মুণ্ডিত হইয়াছে, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, ভগীরথ পাঠক, ভারারিয়ার কাচারী লুঠ ও পাঞ্জু সরদার প্রভৃতিকে ধৃত করিয়া মুদাফা লুঠ করিতে আসিতেছে, ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র কেমরেল সাহেব

ও রামলোচন নন্দী ভয়াভিভূত হইয়া লোক জন সহ কাচারী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুরাগ নদী সন্তরণপূর্ব্বক অপরপারে পলায়ন করেন। ভগীরথ লোকজনসহ সিংহনাদে ঐ কাচারীতে পেঁ ৗছিয়া তাহা লুঠ পাট ও ছিন্নভিন্ন করে; তৎপর বিপক্ষদলের প্রায় ৫০ জন বন্দীসহ জয় দেবপুরে প্রত্যাগত হইল। ঐ যুদ্ধে পাঞ্জুসরদার পরাস্ত ও ধৃত হওয়াতে ভাওয়ালের সমস্ত লোকই মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিল, কারণ পাঞ্জু সর দার অত্যন্ত দৌরাত্ম্যকারী ছিল, সে কি নয় আনী, কি সাত আনী ইহার সকল প্রজার প্রতিই নিষ্ঠুর আচরণ করিত। বল পূর্ব্বক প্রজাদের বাটী হইতে ছাগী ও মুরগী গ্রহণ ইত্যাদি নানা রূপ অহিত আচরণ করিয়া প্রজাগণের বিষম কষ্ট উৎপাদন করিত। জনরবে শ্রুত হওয়া যায় ঐ যুদ্ধে ওয়াইজ সাহেবের পক্ষীয় পাঞ্জু প্রভৃতি প্রায় ৪০। ৫০ জন সরদার নিহত হই য়াছিল। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। ঐ যুদ্ধকালে যে সকল পুলিষ আমলা উপস্থিত ছিল, তাহারাও এই

ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল।

অনন্তর ঢাকার মাজিষ্ট্রেটিতে উভয়পক্ষ হইতেই অভিযোগ উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তদন্ত করিতে আসিয়া ভারারিয়া ও মুদাফার কাচারী দৃষ্ট করত জয়দেবপুরে উপস্থিত হন, তথা হইতে রামকৃষ্ণ হোড় প্রভৃতি ৬। ৭ জন লোককে কয়েদ খালাস করিয়া ঢাকায় গিয়া তত্তাবদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ও আসামী ধৃত করণ ইত্যাদি বিষয়েই তাঁহার ৩। ৪ মাস অতীত হইয়াছিল। পরে সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার পক্ষে আমীর আলী ফকীর নামক যে এক ব্যক্তি ছিল, তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া ভারারিয়া ও মুদাফার লুঠপাট আদি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা দাওরায় সোপর্দ্দ করেন। ঐ মোকদ্দমায় খোদ পক্ষ কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী, চন্দ্রনাথ দেওয়াঞ্জী ও ভগীরথ পাঠক এবং পল্টন তেওয়ারী প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি আসামীশ্রেণী ভুক্ত ছিলেন। কালীনারায়ণ রায় ৫০০০ টাকা

তায়দাদের জামিনীতে থাকেন, তদ্ভিন্ন কেহ ১০০০ কেহ ৫০০ টাকা ইত্যাদি তায়দাদের জামিনীতে আবদ্ধ থাকেন। তৎপর দাওরার বিচারে চন্দ্রনাথ দেওয়াঞ্জী প্রভৃতি কতিপয় আসামী মুক্তি পায় ও পল্টন তেওয়ারী এবং ভগীরথ পাঠক সহ কতিপয় আসামীর ৪ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়, আর কালীনারায়ণ রায়ের প্রতি এই আদেশ হয় যে তিনি ৪০০০ টাকা জরিমানা দিবেন এবং সম্মান সহ ৬ মাস কাল দেওয়ানী ফাটকে থাকিবেন, কিন্তু তিনি ফাটকে যাননা তাঁহার প্রতি এই আদেশও ছিল যে ঐ হুকুমের মর্ম্ম সদর নেজামতে পাঠাইলে তথা হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলে পর তাঁহাকে ফাটকে যাইতে হইবে, এইকাল পর্য্যন্ত উক্ত রূপ জামিনীতেই থাকিবেন। কালীনারায়ণ রায় এই অবকাশ মধ্যে স্বয়ং কলিকাতা যাইয়া ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে নেজামতে আপীল করাতে টগর সাহেবের বিচারে অন্য কতিপয় আসামী সহ মুক্তিলাভ করেন, মাত্র পল্টন তেওয়ারী ও ভগীরথ পাঠক প্রভৃতি কয়েকজন আসামী

৪ বৎসর কাল কারাগারে আবদ্ধ থাকে। ঐ সময় হইতে সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা জীবিতা থাকা পর্য্যন্ত ওয়াইজ সাহেবের সহিত সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিবাদ বিসংবাদ হইয়াছিল, তাহাতে উভয়পক্ষের কেহই সুস্থির ছিলেন না; এমন কি একটী দিবারাত্রিও কেহ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণীর অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ও শাসন প্রভাবেই ভাওয়ালের ৯ নম্বর জমিদারী অর্থাৎ ॥/০ আনী হিস্যা জমিদারী অক্ষতভাবে রক্ষিত হয়। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী ওয়াইজ সাহেবের সহিত এবংবিধ নানা প্রকার বিবাদ বিসংবাদ করিয়াও স্বকীয় বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে পতি পুত্রের বিত্ত সুন্দররূপ রক্ষা করিয়া এবং প্রভূত নগদ সম্পত্তি রাখিয়া, পুত্র গোলোকনারায়ণ রায় ও পৌত্র কালীনারায়ণ রায় বর্ত্তমানে ১২৫১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে জয়দেবপুর গ্রামে মানবলীলা সংবরণ করেন।

৯ম, গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী।

গোলোকনারায়ণ রায় তাঁহার মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণীর মৃত্যু সময়ে কলিকাতায় ছিলেন, অতএব তৎপুত্র কালীনারায়ণ রায় উক্ত চৌধুরাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিয়া ডাক যোগে তাঁহার নিকট পত্র লিখেন। গোলোকনারায়ণ রায় ঐ পত্র পাইয়া তথায় থাকিয়া গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পরে বাটী প্রত্যাগমন করেন। ঐ মহাত্মা তাঁহার নাবালগী অবস্থাবধি তাঁহার মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার জীবিতকাল পর্য্যন্ত জমিদারীর কোন কার্য্যই করেন নাই, কেবল সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া সদালাপ ও যজ্ঞ দানাদি সৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরশ্চরণ ও হোমও করিতেন এবং নিয়তই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সহ শাস্ত্রালাপে কালযাপন করিতেন। তিনি সন্যাস ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন, প্রায় সর্ব্বদাই সন্যাস পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকিতেন; সংসারের প্রতি তাঁহার কিছুই অনুরাগ ছিল না,

অতএব এইরূপ জমিদারীর কার্য্য কিরূপে নি-
র্ব্বাহ হইবে তদ্বিষয়ে দোদুল্যচিত্ত হইয়া পুত্র
কালীনারায়ণ রায়ের প্রতি জমিদারীর ভারার্পণ
করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু কালী-
নারায়ণ রায় বলেন যে "আপনার জীবিত
কাল পর্য্যন্ত আমি কখনই কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ
করিব না, তবে আমার প্রতি যখন যে আজ্ঞা
করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সাধ্যানুসারে
অবশ্য সম্পাদন করিব।" কালীনারায়ণ রায়
এইরূপ উত্তর করিলে প্রধান২ আমলাগণও
এই কথার পোষকতায় অনেক বলিলেন,
অগত্যা তিনি জমিদারীর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে
স্বীকৃত হইয়া ১২৫১ সনের আষাঢ় মাসে কার্য্যে
প্রবৃত্ত হন।

ঐ সময়েও ওয়াইজ সাহেবের সহিত নানা
প্রকারের মোকদ্দমা চলিতেছিল, তজ্জন্য কখন্
কি হয় বলিয়া সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন।
কখন বা কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা প্রমাণ, সংগ্র-
হাদি প্রবঞ্চনা মূলক কোন কাণ্ড তাঁহার সমীপে
উপস্থিত হয়, ইহাও তাঁহার এক আশঙ্কার

বিষয় ছিল। ঐ মহাত্মা স্বয়ং মিথ্যা ব্যবহার করা দূরে থাকুক, অন্যকে মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিলে বা শুনিলে তাহাও তাঁহার চক্ষু কর্ণের শূল হইয়া দাঁড়াইত। এই নিমিত্তই তিনি বিপুল সম্পত্তির সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বে কলিকাতা, মুরসিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত মাতার মৃত্যু সময়েও সাক্ষাৎ থাকিতে পারেন নাই।

গোলোকনারায়ণ রায় অতিশয় দয়ালু পুরুষ ছিলেন। কোন কর্ম্মচারী কোন প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে তিনি যারপর নাই দুঃখিত হইতেন। প্রজাগণ আসিয়া কাকুতি পূর্ব্বক পয়মালী জমির জমা মিনাহ অথবা কোন কোন জমির দর কমী চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। তৎপর সালতামামীতে নিকাশকালে পূর্ব্ব সন হইতে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা কম স্থিত হইয়া পড়িত। কালীনারায়ণ রায় এইরূপ ঘটনা দৃষ্টে স্বয়ং জমিদারীর ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু গোলোকনারায়ণ রায় ভাবি-

লেন যে, কালীনারায়ণ আমার একমাত্র পুত্র, তাহাতে তাহার সহিত ওয়াইজ সাহেবের যেরূপ প্রবল শত্রুতা আছে, কি জানি এইক্ষণ তাহার হস্তে জমিদারীর ভারার্পণ করিলে ওয়া-ইজ সাহেবের সঙ্গে কোন বিবাদ উপস্থিত হ-ইতে পারে। অতএব তিনি সহসা কালীনারা-য়ণ রায়ের হস্তে জমিদারী অর্পণ না করিয়া ঢা-কায় গমন করেন এবং প্রথমেই স্বকীয় কর্ম্মচারী প্রভৃতির অজ্ঞাতসারে একাকীমাত্র ওয়াইজ সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। ওয়াইজ সাহেব গোলোকনারায়ণ রায়কে পরম ধার্ম্মিক জানিতেন এবং পূর্ব্বাব-ধিই গোলোকনারায়ণ রায়ের সঙ্গে তাঁহার প্র-ণয় ছিল, তৎপ্রযুক্ত প্রথম আলাপের দিবসই উভয়ের একবাক্যে সন্ধিবন্ধন সুস্থির হইয়া পর দিবস সন্ধিপত্র অর্থাৎ একরার লিখাপড়া হইয়া রেজেষ্টরী করা হয়, পরে গোলোকনারায়ণ রায় ১২৫২ সনের শ্রাবণ মাসে কালীনারায়ণ রায়ের নামে জমিদারী ইস্তকালী করিয়া কালেক্টরী ও আদালত, ফৌজদারীতে কায়েম মোকামী করিয়া

দেন। ঐ সন হইতে ১২৫৬ সনের কতককাল পর্য্যন্ত ভাওয়ালের ॥/০ আনী ও ।৶০ আনীর প্রজা এবং উভয় পক্ষের আমলা ও কর্ত্তৃপক্ষগণ সুস্থিরচিত্ত ছিলেন।

গোলোকনারায়ণ রায় কালীনারায়ণ রায়ের হস্তে জমিদারী অর্পণ করিয়া কয়েকটী সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রথম, তাঁহার বাটীর পশ্চিম দিকে যে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল, তাহার জল শরৎকালে রক্তিমাকার হইত, তিনি তাহা সেঁচাইয়া অতি বৃহদাকারে ও অতি গভীর করিয়া খনন পূর্ব্বক তাহাতে দুইটী পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করেন। ঐ জলাশয়ের জল তদ্‌বধি একাল পর্য্যন্ত উত্তম রহিয়াছে। দ্বিতীয়, ৺ ঠাকুর মাধব বিগ্রহের বাটীতে পূর্ব্বে কেবল খড়ের ঘর ছিল, তিনি তাহা এককালে চকমিলান পাকা বাটী প্রস্তুত করাইয়া দেন। তৎপর নিজ বাস বাটীতে যে সকল খড়ের ঘর ছিল, তৎস্থলে বৃহদাকারে পাকা দুই মহল্লা করিয়া প্রস্তুত করেন। তাঁহার পিতা প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ঢাকা মোকামে নিজের কোন বাটী

ছিল না। তাঁহারা সময়ে২ ঢাকায় গেলে ভাড়া-
টিয়া বাটীতে বাস করিতেন, তিনি তদভাব
নিবারণার্থ মাদারঝাণ্ডার গল্লিতে নাজীর মুন্না-
দালার কিঞ্চিৎপরিমাণ স্থান ক্রয় করিয়া তথায়
অতি বৃহৎ এক অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ
অট্টালিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে
জয়দেবপুরে আহারীয় দ্রব্যাদি নিতান্তই দুর্ঘট
ছিল, একখানামাত্র মুদী দোকান ছিল, তাহাতে
তৈল লবণ ভিন্ন সাধারণ আহার্য্য বস্তুই পাওয়া
যাইত না। গোলোকনারায়ণ রায় এই অসুবিধা
নিবারণ জন্য নিজ বাটীর দক্ষিণাংশেই বিস্তীর্ণ
একটী বাজার বসাইয়া তাহাতে প্রতি সোমবারে
হাট মেলার দিন ধার্য্য করেন। তদবধি একাল
পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতির
পূর্ব্বরূপ অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়না। এই শেষোক্ত
কার্য্য দুইটী তাঁহার মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা
বর্ত্তমানেই তিনি উদ্যোগী হইয়া করেন। আর
তাঁহার মাতা বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার বাড়ীর পশ্চি-
মদিকে স্থাপিত ৺ মাধবের বাড়ীর পশ্চিমাংশে
এক মন্দির ও তদুপরি এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া

তাহাতে তারা মূর্ত্তি স্বয়ং স্থাপন করেন এবং সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা দ্বারা ঐ মঠের নিম্নে শিব ও তাহার বামপার্শ্বে দুর্গামূর্ত্তি স্থাপন করেন। সিদ্ধেশ্বরী দেব্যার মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্মশানোপরি এক মন্দির সহ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

গোলোকনারায়ণ রায় উল্লিখিতরূপে সৎ কার্য্যেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন; কখনও কোন অন্যায় কার্য্যে দেহ কি মন লিপ্ত করিতেন না। তাঁহার নিবারণ সাধ্য স্থলে তাঁহার চক্ষুর গোচরে কখনই কেহ কাহারও অন্যায় করিতে সক্ষম হইত না। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে কালযাপন করিতেন। কখন২ বালকগণকে আনাইয়া তাহাদের ক্রীড়া দেখিতেন। নানা প্রকার পক্ষী পোষণ কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। সময়ে২ পাখীর লড়ায়ের তামাসা দেখিতেন। গো, মহিষাদি পশু পালনে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। তিনি কাহাকেও বিমর্ষ দেখিতে পারিতেন না, এমন কি তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ রায় সর্ব্বদা জমিদারীর কার্য্যে ব্যস্ত

থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকেও তিনি ডাকিয়া আনিয়া বলিতেন যে,সর্ব্বদা এককার্য্যে থাকিলে অন্তঃকরণ ত্যক্ত হইয়া উঠে, অতএব কখন২ গান বাদ্যাদি দ্বারা আমোদ করিও। গোলোক-নারায়ণ রায় ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, সৎপথগামী, জিতেন্দ্রিয়, উদারচরিত্র, দয়ালু, সৌম্যমূর্ত্তি ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন প্রজা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াও তাঁহার নিকট যথার্থরূপে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার দণ্ডের অনেক লাঘব করিতেন। কখনও কোন প্রজার বাটী হইতে কোন বস্তু চাহিয়া আনিতেন না, অথচ কোন প্রজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে এক গাছি শাক প্রদান করিলেও তাহা তিনি অতি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেন, তাঁহার প্রতি প্রজাবর্গের এত দূর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে কেহ কোন বিপদে পতিত হইলে অথবা কোন বৃক্ষে ফল না জন্মিলে তাঁহার নামে মানস করিত, এবং সময়ে২ যাহার যে মানসিক বস্তু আনিয়া দিত। অদ্যাপি প্রজাদের সেই ভক্তির স্থিরতা থাকা হেতু মানসিক সামগ্রী

তাঁহার শ্মশান মন্দিরে প্রদান করিতেছে, তাঁহার সমকালীন অন্যান্য জমিদারবর্গ ও রাজপুরুষগণ এবং অপর সাধারণ সকলে তাঁহার উল্লিখিত গুণকলাপের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিতেন। অদ্যাপি তাঁহার চিত্রপট বর্ত্তমান আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি যে নিতান্ত ধার্ম্মিক ও সদ্‌গুণশালী ছিলেন, স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

ওয়াইজ সাহেবের সহিত গোলোকনারায়ণ রায়ের সন্ধিবন্ধন হওয়ার পর অবধি ১২৫৬ সনের কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ভাওয়ালের লোক সকল একপ্রকার সুখেই কাল কর্ত্তন করিয়াছিল। অনন্তর হঠাৎ উভয় কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে ৷৷/০ আনীর ৯ নং বিসইয়া মৌজার অন্তর্গত লক্ষ্মীর বাইদের ধান্য কাটা উপলক্ষে সাহেবের ডিহী মৃজাপুরের তহশীলদারের ও কালীনারায়ণ রায়ের পাইনসাইল মৌজার তহশীলদারের তর্ক উপস্থিত হয়; তৎপর উক্ত সনের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম তারিখে প্রাতে ওয়াইজ সাহেবের পাক্কীর গোলাপ সিংহ প্রভৃতি কয়ে-

কতজন লোক যাইয়া ঐ বাইদের ধান্য কর্ত্তন আরম্ভ করে। কালীনারায়ণ রায়ের তহশীলদার তত্ত্ব পাইয়া মৃজাপুর কাচারীর নিযুক্তীয় লোক উচিতরাম বংশীর পুত্র গিরিবংশী ও লোচন বংশী ও কাশী বংশীকে উক্ত স্থানে প্রেরণ করে। তাহারা যাইয়া নানারূপ নিষেধ করা-তেও গোলাপসিংহ প্রভৃতি তাহা গ্রাহ্য করে না। তৎপর তথায় উভয়দলের দাঙ্গা উপস্থিত হয়। সাহেব পক্ষীয় গোলাপসিংহ গিরি বং-শীর এক আঘাতে মৃতকল্প হইয়া ভূতলশায়ী হওয়াতে, তৎপক্ষের অন্যান্য সমুদয় লোক পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। ঐ তত্ত্ব জয়দেব-পুরে আসিলে, জয়দেবপুরস্থ সকলে চমৎকৃত হন এবং কালীনারায়ণ রায় গোলাপসিংহকে শবের ন্যায় জয়দেবপুরে আনাইয়া নানা প্রকার চিকিৎসা দ্বারা রক্ষা করেন।

ওদিগে সাহেব সরকারে এই সংবাদ পৌঁ-ছিলে সাহেব, গোলাপসিংহ নিহত হইয়াছে বলিয়া কালীনারায়ণ রায় প্রভৃতিকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করত: ফৌজদারীতে এক মোকদ্দমা

উপস্থিত করেন। ঐ মোকদ্দমাতে অন্যান্য আসামিগণ সহ কালীনারায়ণ রায় হাজির হন এবং জামিনীতে থাকেন। তৎপর গোলাপসিংহ হাজির হয়। বিচারে হত্যা সাব্যস্ত না হইয়া এক দাঙ্গা সাব্যস্ত হয়। কালীনারায়ণ রায় ও তাঁহার তৎকালীন প্রধান কর্ম্মচারী হরদয়াল ঘোষ মুক্তি পান এবং অন্য কয়েকজন আসামী দুই বৎসর কারাবাস করে। এই মোকদ্দমাটী ১২৫৬ সনের শেষ কি ১২৫৭ সনের প্রথম ভাগে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। গোলোকনারায়ণ রায় সন্ধির পরও এইরূপ ভয়াবহ কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া মোকদ্দমার পর সত্বর ঢাকায় যান এবং ওয়াইজ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানা কৌশল ক্রমে সাহেবকে বলিলেন "আপনার সহিত সন্ধি হওয়া সত্বেও বিবাদ নিঃশেষিত হইল না, ইহাতে নিতান্ত অসুখী আছি। যখন এক পরগণাতে দুইজনই অধিকারী আছি, তখন ভবিষ্যতেও সময়ে২ এই প্রকার ঝগড়া বিবাদ হইবে, অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ আমার একটী মাত্র-পুত্র, কি জানি

পুনরায় কখন্ এইরূপ কোন্ মোকদ্দমাতে আবদ্ধ হইয়া কারাগারে যাইতে হয়, নিশ্চয় নাই। দৈবগতিতে তদ্রূপ ঘটিলে আমার মৃত্যু কালেও, বা আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না। এবংবিধ নানারূপ আশঙ্কা আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত আছে, অতএব আমার ভাওয়ালের ৷৷/০ আনী অংশ আমার বাঞ্ছানুরূপ মূল্য দিয়া আপনি ক্রয় করুন, অথবা ।৵০ আনী অংশে আপনার যাহা ক্রয় সূত্রে দখল আছে, তাহার যে মূল্য চাহেন তাহা আমার সাধ্য হইলে আমি দিয়া ক্রয় করিব।" সাহেব এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আপনি কেন বিক্রয় করিবেন? যদি আমার খরিদা-হিস্যার ফি আনায় একলক্ষ টাকা আমাকে দেন তবে আমিই বিক্রয় করিব।" সাহেব এই কথা বলা মাত্র গোলোকনারায়ণ রায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বাটীতে চলিয়া আসেন এবং ঐ সংবাদ কালীনারায়ণ রায়ের নিকট বলেন। কালীনারায়ণ রায় এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও বন্ধুবর্গ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কেহ২

গোলোকনারায়ণ রায়কে ঐকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় বাধ্য না হইয়া স্বকীয় সঙ্কল্পীকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১২৫৮ সনের ভাদ্র মাসে উক্ত খরিদ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা স্থিরতর হইয়া শারদীয় পূজা উপলক্ষে কাচারী বন্ধের সময় কতক লিখা পড়ার কার্য্য হইয়াও সম্পূর্ণরূপ না হওয়ায় বাটীতে চলিয়া আসেন। তৎপর কার্ত্তিকমাসে পরিবার সহ পুনরায় ঢাকা যাইয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎকালে ঢাকায় অত্যন্ত মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল, ওলাউঠা রোগে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী হরদয়াল ঘোষের এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। তাঁহার তৃতীয় পরিণয়ের স্ত্রীও (কালীনারায়ণ রায়ের বিমাতা) ওলাউঠা রোগে কাতরা হওয়াতে কালীনারায়ণ রায় নিতান্ত ভীত হইয়া গোলোকনারায়ণ রায়কে সপরিবারে বাটীতে লইয়া আইসেন। অনন্তর অল্প দিবস অন্তেই ঢাকাতে ঐ মারীভ-য়ের নিবৃত্তি হওয়ায় পৌষ মাসে কালীনারায়ণ রায়কে সঙ্গে করিয়া গোলোকনারায়ণ রায়

টাকা যান এবং তৎকাল পর্য্যন্তও মারীভয়ের আশঙ্কা থাকাতে সহরে না উঠিয়া নৌকাতে বাস করেন। ২৬ শে পৌষ ক্রয় কার্য্য সমাধা হয়। মোট বিক্রেয় মূল্য ৪৪৬০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়া কওয়ালা লিখিত পড়িত হয়। ঐ নির্দ্ধারিত মূল্যের কিয়ং পরিমাণ টাকা নগদ দিয়া বক্রী টাকার কিস্তিবন্দীক্রমে তমঃস্থক দেন। ঐ সময়ে সাহেবের যে অল্প হিস্যা ইজারা সূত্রে ছিল, তাহাও দর ইজারা লন। এই হইতেই ওয়াইজ সাহেবের সহিত গোলোকনারায়ণ রায়ের এবং তৎপুত্র কালীনারায়ণ রায়ের বিবাদের হেতু সকলের মূল উন্মূলিত হইয়াযায়। বক্রী টাকার যে তমঃস্থক দেওয়া হইয়াছিল, গোলোকনারায়ণ রায়ের কৌশলে ও কালীনারায়ণ রায়ের উদ্যোগে এবং ভাওয়ালের ॥/০ আনী ও ।৶০ আনীর প্রজাগণের সাহায্যে ১২৬২ সনের মধ্যেই তৎসমুদয় টাকা পরিশোধ হইয়া যায়। তৎপর ১২৬৩ বঙ্গাব্দে গোলোকনারায়ণ রায়, কালীনারায়ণ রায়কে বলেন যে, “যদি তোমার নিকট কাহারও কিছু পাওনা থাকে, তবে তাহা এই

সনের শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই আদায় করিও ।”
কালীনারায়ণ রায় ঐ কথামতে উক্ত কর্ম্মে
সত্বরপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত সনের শ্রাবণমাস মধ্যেই
সমুদায় দেনা পরিশোধ করিয়া অঋণী হইলেন।
ঐ বৃত্তান্ত কার্ত্তিক মাসে গোলোকনারায়ণ রা-
য়কে জ্ঞাত করাইলে তিনি হর্ষচিত্ত হইয়া কালী-
নারায়ণ রায়কে বলিলেন, “তুমি কখনও জ্ঞাত
সারে কোন ব্যক্তির ঋণ রাখিও না, বরং একত্রে
সমুদয় পরিশোধ করিতে না পারিলে ক্রমে আ-
দায় করিও, তথাপি কাহাকে বঞ্চনা করিওনা।”

গোলোকনারায়ণ রায় প্রথমাবস্থায়, কীর্ত্তি
নারায়ণ রায়ের খানসামা পূর্ব্বোল্লিখিত বোচাই
সীকদারের পুত্র জগন্নাথ সীকদারের সঙ্গে
একটী মোকদ্দমা করেন। অর্থাৎ উক্ত জগন্নাথ
সীকদার পৈতৃক বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া
ভদ্রবিশিষ্ট ও তদপেক্ষা কুলাংশে শ্রেষ্ঠ কায়স্থ-
দিগের সঙ্গে সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা করত ধনগর্ব্ব
হেতু গোলোকনারায়ণ রায়ের দাসত্ব অস্বীকার
করে। অতএব গোলোকনারায়ণ রায় দাসত্ব
দাবিতে তাহার নামে আদালতে এক মোকদ্দমা

উপস্থিত করেন। বিচারপতি ফেরিকেরাকেট্ সাহেবের বিচারে জগন্নাথ সীকদার দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে। এদেশে ঐরূপ মোকদ্দমায় পূর্ব্বের দাসগণ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার কোন নিয়ম ছিলনা, ঐ মোকদ্দমায় উক্ত সাহেব প্রকাশ করেন যে দাসত্ব স্বীকার করিলেই যে সে, কি তাহার বংশীয় লোকে যাবজ্জীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবে, ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। সেই হেতুতেই জগন্নাথ সীকদারের দাসত্ব মোচন হয় এবং ঐ হেতুটী বিধিবদ্ধ হইয়া একটী নজীর হয়। জগন্নাথ সীকদার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ গোলোকনারায়ণ রায়ের পদানত হইয়া বিদ্রূপ সূচক প্রণাম করে, তাহাতে গোলোকনারায়ণ রায় তাহাকে বলেন যে, "যদি তুমি আমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া থাক, তবে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া ধনে জনে সুখ সম্ভোগ করিতে থাক, কিন্তু যদি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে অচিরেই ইহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে।" এই বাক্য শুনিয়া জগন্নাথ সীকদারের মুখ শুষ্ক

হইয়া গেল এবং বাটীতে যাইয়া অল্পকাল মধ্যেই জগন্নাথ কালকবলে পতিত হইল। তাহার পৈতৃক বিত্ত সম্পত্তি সমস্ত বহির্ভূত হইয়া গেল, তৎপর অল্প সময় মধ্যেই ঐ বংশ সমূলে নির্ম্মূল হইল।

গোলোকনারায়ণ রায় ১২৬৩ সনের ১২ই পৌষ বুলবুলের পালীতে যাইয়া তথায় বুলবুলের লড়াই দেখিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীরে কিঞ্চিৎ জ্বরের আবির্ভাব হওয়াতে তথা হইতে অন্তঃপুরে চলিয়া যান। ঐ জ্বরে কাতর হওয়াতে ১৩ই পৌষ বেলা ১১ ঘটিকার সময় ৺ মাধব বাটীতে নীত হন। তথায় নীত হইয়া পুত্র কালীনারায়ণ রায়কে এবং তৃতীয় পরিণয়ের স্ত্রী নীলমণি দেব্যা চৌধুরাণী ও তদ্গর্ভজাতা স্বর্ণময়া দেব্যা নাম্নী অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা এবং কালীনারায়ণ রায়ের দুই স্ত্রী ও শেষ পরিণয়ের স্ত্রীর গর্ব্ভজাতা বালিকা কৃপাময়ী দেব্যাকে সাক্ষাতে রাখিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই অতি জ্ঞানের সহিত মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জয়-

দেবপুরের অরণ্যাদি পরিষ্কার ও প্রশস্ত পথ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং কালীনারায়ণ রায়কে ঐরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া যান। রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি গোলোকনারায়ণ রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য আছেন, তিনি এইক্ষণ স্বকীয় বিত্ত সম্পত্তি আপন গুরুপত্নী নীলমণি দেব্যা চৌধুরাণীকে প্রদান করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জয়দেবপুরের উত্তর পূর্ব্বাংশে গোলোকনারায়ণ রায়ের শ্মশানমন্দিরে অবস্থিত করিতেছেন। তথায় কালীনারায়ণ রায় তাঁহার ভরণ পোষণোপযোগী মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভ্রমণোপলক্ষে যে সকল ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হন, উক্ত চক্রবর্ত্তী সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা জলপান করাইয়া থাকেন। এইক্ষণ তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে।

১০ম, কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর।

গোলোকনারায়ণ রায়ের প্রথম পরিণীতা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেব্যা চৌধুরাণীর গর্ব্ভে ১২২৫ সনের ২৫ শে শ্রাবণ কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর জন্ম হয়। কালীনারায়ণ রায়ের জন্মের ৪বৎসর ৭ মাস পূর্ব্বে উক্তা চৌধুরাণীর গর্ব্ভে একটী কন্যার জন্ম হয় *। আনন্দময়ী দেব্যার ৯ বৎ-

* ঐ কন্যার নাম আনন্দময়ী রাখা হয় এবং গোলোকনারায়ণ রায় বর্ত্তমানেই তারপাশা নিবাসী মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক কুলীন কুমারের হস্তে তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়া নিজ বাটীর পূর্ব্বাংশে তাঁহার এক বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। আনন্দময়ী দেব্যার গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। পুত্রটীর ৯ মাস বয়ক্রম কালে আনন্দময়ীর মৃত্যু হয়, তৎপর গোলোকনারায়ণ রায় উক্ত মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্বকীয় জ্ঞাতির একটী কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে আপন জমিদারীর নায়েবী পদে নিযুক্ত করেন। আনন্দময়ীর গর্ভজাত পুত্রটী ৯ বৎসর বয়ক্রমকালে কালকবলে পতিত হয়।

সর ও কালীনারায়ণ রায়ের ৪ বৎসর ৩ মাস বয়ঃক্রম কালে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেব্যা চৌধুরাণীর মৃত্যু হয়। তখন গোলোকনারায়ণ রায়ের মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী কালীনারায়ণ রায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে প্রতিপালন করেন। গোলোকনারায়ণ রায়ের বিপুল বিত্ত সম্পত্তি সত্ত্বেও এই একটী পুত্র কালীনারায়ণ রায় মাত্র তাহাতে শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন বিধায় বংশের নিতান্ত আদরণীয় হওয়াতে বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে একান্ত ত্রুটি হয়, কেবল স্বজাতীয় বাঙ্গলাভাষা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র তাঁহার শিক্ষা হয়। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হওয়ার সঙ্গেই তাঁহার অশ্বারোহণের অনুরাগ জন্মে এবং তজ্জন্য তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে একটী উৎকৃষ্ট ঘোটক ক্রয়করিয়া দেন। কালীনারায়ণ রায় অল্পকাল মধ্যেই অশ্বচালনায় বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠেন। শিক্ষার পর প্রায়ই তিনি অশ্বারোহণে ঢাকায় গতায়াত করিতেন। তাঁহার ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা গোলোকনারায়ণ রায় উদাসীনের ভাব আশ্রয়

করিয়া স্বকীয় জমিদারীর অন্তর্গত বান্দাখোলা নামক এক মহাল ওয়াইজ সাহেবের নিকট ইজারা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ৫০০০ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক গোপনভাবে কামাক্ষা গমন করেন। ইহাতে গোলোকনারায়ণ রায়ের মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেব্যা নিতান্ত দুঃখিতা ও উদ্বিগ্না হইয়া নানা দিগ্‌দেশে লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অনুদ্দেশ প্রযুক্ত এককালে জ্ঞানশূন্যা প্রায় হইয়া পড়িলেন। তাহাতে আবার তৎকালে বাড়ীয়া গ্রাম নিবাসী ঘোষ ও মজুমদার বংশের সহিত বান্দাখোলার উত্তর ও বাড়ীয়ার দক্ষিণস্থ এক জমীর শস্য কর্ত্তন উপলক্ষে এক ভয়ানক ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উক্ত ঘোষ ও মজুমদারদের একান্ত বাধ্য বাড়ীয়া নিবাসী বিপুল সাহসী শ্যাম সিকদার নামক এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে দা লইয়া স্বকীয় বাম বাহুতে তিনটী আঘাত করে এবং তাহা দেখাইয়াই ঐ তুমুল মোকদ্দমা আরম্ভ করে। বাড়ীয়া নিবাসী রামদয়াল ও জয়নাথ ঘোষ পূর্ব্বাবধিই কালী-

নারায়ণ রায়ের ও তাঁহার পিতা পিতামহাদির হিতকারী থাকা বিধায় তাহাদিগের মধ্যে জয় নাথ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনকে ঐ মোকদ্দমায় আসামী শ্রেণী ভুক্ত করিয়া হাজতে দেয়। অল্প বয়স্ক কালীনারায়ণ রায় এই সমস্ত দুর্ঘটনা দেখিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া রামদয়াল ঘোষকে সঙ্গে লইয়া তৎকালীন ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ওয়াল্টার সাহেবের কুঠিতে যাইয়া স্বকীয় অবস্থা সমুদয় তাঁহার গোচর করেন। ওয়াল্টার সাহেব সমুদয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ জামীন গ্রহণে জয়নাথ ঘোষ প্রভৃতিকে মুক্তি দেন। ওয়াল্টার সাহেবের মেমও কালীনারায়ণ রায়ের শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ ও পিতার অনুদ্দেশ তত্ত্ব শুনিয়া একান্ত শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন; তৎপ্রযুক্তই কালীনারায়ণ রায়ের সাহস ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রত্যহই উক্ত সাহেবের কুঠিতে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার সমবয়স্ক যে ওয়াল্টার সাহেবের একটী পুত্র ছিল, তৎসহ অশ্ব চালনা ও খেলা করিতেন।

কালীনারায়ণ রায় এইরূপে অন্যান্য সাহেব-

গণের নিকটেও পরিচিত হইলেন এবং গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তৎকালীন ঢাকার ডাক্তর লেম সাহেবের সঙ্গেও তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ও আলাপাদি ছিল, তৎপ্রযুক্ত উল্লিখিত শ্যাম সিকদার যে আপন হস্তে আপনি দাত্রাঘাত করিয়া ডাক্তরখানায় নীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি উক্ত ডাক্তর সাহেবের গোচর করিলে, ডাক্তর সাহেব তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিয়া তদ্রূপ রিপোর্ট দেন। ঐ রিপোর্টের বলে এবং অন্যান্য উচিত তদ্বিরে কালীনারায়ণ রায় উক্ত ফৌজদারী মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। তাঁহার পক্ষের যে সকল লোক আসামী ছিল, সকলেই মুক্তি লাভ করেন। অনন্তর যে জমী শস্যসম্বন্ধে বিবাদ ছিল, ঐ জমী কালীনারায়ণ রায় তাঁহার বান্দাখোলা মহালের সামীল করেন। উক্ত মোকদ্দমা প্রযুক্ত বাড়ীয়ার সামীলে অনেক জমী ডিক্রী হইয়া বান্দাখোলা মহাল ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত ওয়াল্টার সাহেব কালীনারায়ণ রায়কে একান্তই শ্রদ্ধা করিতেন, কালীনারায়ণ

রায় যে কয় দিবস ঢাকায় থাকিতেন, তন্মধ্যে দুই এক দিবস উক্ত সাহেবের কুঠিতে না গেলেই সাহেব আরদালী পাঠাইয়া তাঁহাকে নেওয়াইতেন। ওয়াল্টার সাহেব তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পক্ষেও যাত্নিক হইয়া তাঁহার সদর নায়েব রামদয়াল ঘোষের প্রতি তাড়না দিয়া তৎসময় প্রচলিত পারস্যভাষা শিক্ষা আরম্ভ করাইয়া দেন। কালীনারায়ণ রায়ের পিতা যে বান্দাখোলা ইজারা দিয়া ওয়াইজ সাহেব হইতে ৫০০০ টাকা লইয়াছিলেন, ওয়াল্টার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া ঐ টাকা ওয়াইজ সাহেবকে দেওয়াইয়া ইজারা খালাস করিয়া দেন এবং জিলায়২ পরোয়ানা প্রচার করিয়া অনুদ্দিষ্ট গোলোকনারায়ণ রায়ের কামাখ্যা থাকার তত্ত্ব আনাইয়া দেন। কালীনারায়ণ রায়ের প্রতি তাঁহার এতদূর স্নেহ ছিল যে সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিয়া অন্যান্য রাজপুরুষগণের কুঠিতে গমনাগমন করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া দিতেন এবং তাঁহাকে আগ্রহ পূর্ব্বক প্রায় সর্ব্বদাই ঢাকায় রাখিতেন।

ঐ সময় হইতেই কালীনারায়ণ রায় সাহেব-গণের দরবার এবং সমধর্ম্মী ভূম্যধিকারিগণের নিকট যাতায়াত ও আলাপ ব্যবহারাদি করিতে শিক্ষা পান। কখন২ তৎকালীন ঢাকার নবাব কামালোদ্দৌলার দরবারেও গমনাগমন করি-তেন। বাল্যকালে কালীনারায়ণ রায় অতি সু-গঠন সুন্দরআকৃতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন এবং আলাপাদির চাতুর্য্যেও বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন, এপ্রযুক্ত ঢাকার রাজপুরুষগণ, প্রসিদ্ধ নীলকর ওয়াইজ সাহেব, ডাক্তর লেম সাহেব, মৃজা গোলামপীর সাহেব এবং খাজে আলীমউল্লা সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে নিতান্ত শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ করিতেন।

কালীনারায়ণ রায় বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে২ বন্দুক ছোড়াও শিক্ষা করেন, এবং সাহেবদিগের সহিত শীকারে প্রবৃত্ত হন, অল্পকাল মধ্যে তিনি শীকারে বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠেন। তখন কোন জন্তু বা বস্তু তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইত না। এপ্রযুক্ত জজ কুক্ সাহেব, কাপ্তান গার্ডেন সা-হেব, সাট্মন সাহেব এবং সিসিলস্ সাহেব প্র

ভৃতি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। সময়েং তাঁহাদিগের সঙ্গে শীকারে লইয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি এরূপ শীকারপ্রিয় হন যে স্বয়ং ১০।১২ টী হস্তী সংগ্রহ করিয়া বাস্তু গ্রামে জয়দেবপুরের ও ভাওয়ালের অপরাপর অংশের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষাদি হিংস্রজন্তু বধকরিতে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার পিতা তাঁহার এবম্প্রকার দুঃসাহসিকতা দর্শন করিয়া নানা প্রকারে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি ঐ নিষেধ না মানিয়া গোপনভাবে শীকারে গমন করিতেন। এই প্রকারে বহু সংখ্যক হিংস্রজন্তুর বিনাশ সাধন করিয়া ভাওয়ালকে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব করেন, শীকার নিবন্ধন অনেক সাহেব লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ও প্রণয় হয়। পূর্ব্ববর্ণিত ওয়াইজ সাহেবের সহিত যে ভয়ানক যুদ্ধ কাণ্ড হয়, তাহারও মূল তিনিই বটেন। এইক্ষণও হস্তী শীকারে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ আছে। তিনি আগরতলার রাজার অধীনে ও আসাম অঞ্চলে হস্তী ধরার কারণ অনেকগুলি কুন্‌কী সংগ্রহ করিয়া খেদা বাঁদী পরতালা প্রভৃতি নানা কৌ-

শলে বর্ষে২ অনেক আরণ্য হস্তী ধৃত করিয়া থা কেন। তাঁহার চেষ্টা উদ্যোগ ও পরিশ্রমে নি-জবসত গ্রাম জয়দেবপুরের জঙ্গল আবাদ হ-ইয়া গাড়ী ঘোড়া চলার উপযুক্ত প্রশস্ত পরি-ষ্কৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভাওয়া-লের অন্যান্য অনেক-স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার হ-ইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। জয়দেবপুরের পশ্চিম দক্ষিণাংশে কয়েকটী টিলা আবাদ করা ইয়া তাহাতে তিনি চা-বাগিচা প্রস্তুত করিয়া-ছেন। ঐ সকল বাগিচাতে বিলক্ষণ চা উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে ভাওয়ালে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্পমাত্র ছিল, এইক্ষণ তাঁহারই যত্নে য়া কিছু ভদ্রলোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কালীনারায়ণ রায় তিন বিবাহ করেন। ১২৩৯ অব্দে তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়; তাহার ১০ মাস পরেই ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তান হইয়াছিল না। তৎপর ১২৪৩ সনে দ্বিতীয় পরিণয় হয়; ঐ দ্বিতীয়ার গর্ব্ভে ১২৫১ সনের ফাল্গুন মাসে একটী কন্যা জন্মিয়া, মাত্র একমাসকাল জীবিত ছিল। তৎপর ৫। ৬

বৎসর মধ্যে আর সন্তান না হওয়ায় তাঁহার পিতা বহু প্রযত্নে তাঁহাকে আর একটী বিবাহ করান, এই তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে তাঁহার এক কন্যা জন্মে, কন্যার নাম কৃপাময়ী দেবী। অনন্তর ঐ স্ত্রীর গর্ব্ভেই ১২৬৫ সনের আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, ঐ পুত্রের নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় সংপ্রতি পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন; ইনি সুশ্রী, সৌম্যমূর্ত্তি, নম্র স্বভাব এবং বয়সানুসারে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিরও বিলক্ষণ তীক্ষ্নতা দৃষ্ট হইতেছে।

কালীনারায়ণ রায় জমিদারীতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে স্বকীয় জমিদারীর নিকটস্থ ভূমি ও পরগণার অংশ যাহা বিবেচনা মতে ক্রয় করা উপযুক্ত মনে করিয়াছেন, তাহা ক্রয় করিয়া স্বকীয় বিত্ত সম্পত্তির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছেন। জয়দেবপুরস্থ তাঁহার নিজবসত বাটী সমুদয় পাকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঢাকাতে বুড়ীগঙ্গার তীরস্থ কতক স্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে সময়ে২ বাস করিবার জন্য এক পাকা

বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তৎসংলগ্ন বু-
ড়ীগঙ্গাতে অতি বৃহৎ একটী পাকা ঘাট প্রস্তুত
করিয়াছেন। ঢাকাতে ঐবাড়ী ভিন্ন তাঁহার নিজ
ক্রীত আরও ৩ টী পাকা বাটী আছে। এত-
দ্ভিন্ন কলিকাতা রাজধানী এবং কাশীধামে
বাসোপযোগী এক একটী বাটী তিনি নিজ উ-
দ্যোগেই ক্রয় করিয়াছেন। জয়দেবপুরে কয়ে-
কটী পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। জয়দেবপুর হইতে
৩ টী উৎকৃষ্ট পথ নির্ম্মিত হইয়া একটী ঢাকা
হইতে ময়মনসিংহ যাওয়ার জন্য ভাওয়ালের
মধ্যদিয়া যে রাজবর্ত্ম আছে, তাহার সহিত
মিলিত, আর একটী কড্ডা নামক স্থান পর্য্যন্ত
এবং তৃতীয়টী জয়দেবপুর হইতে বলধা পর্য্যন্ত
গিয়াছে। ইহা ভিন্ন চিলাই নামক খালে একটি
কাষ্ঠ সেতু প্রস্তুত করিয়া লোকের গমনাগমনের
বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। জয়দেবপুরে
একটী ইংরেজী-বঙ্গ-বিদ্যালয় এবং একটী
দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী পোষ্টাফিস স্থা-
পন, এতদ্ভিন্ন ভাওয়ালস্থ বাড়ীয়া বক্তারপুর
প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থানে কয়েকটী বি-

দ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বদেশের শ্রী ও উন্নতি বৃদ্ধির বিলক্ষণ সদুপায় করিয়াছেন। ভাওয়ালের বহুবিধ অনিয়ম ও ঘৃণিত ব্যবহার তাঁহা কর্তৃক অপেক্ষাকৃত অপসারিত হইয়াছে। বিদ্যালোচনার্থে ও অন্যান্য সৎকার্য্যার্থ সময়েং তিনি তাঁহার সাধ্যানুসারে অর্থদান ও যত্ন করিয়া থাকেন, তৎপ্রযুক্ত সময়েং গবর্ণমেণ্ট হইতে বহুবিধ প্রশংসা পত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকেই তৎপ্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট আছেন। ঢাকার কি অন্যান্য স্থানের ভদ্রবিশিষ্ট ইংরেজগণ প্রায়ই শীকার উপলক্ষে ভাওয়ালে আসিয়া তাঁহার সৌজন্য গুণে তাঁহার বাটীতেই বাস করিয়া থাকেন। এপ্রযুক্ত তিনি তাঁহার বাটীতে তাঁহাদের বাসোপযোগী সুবৃহৎ অত্যুৎকৃষ্ট একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত নানা প্রকার বহুমূল্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে কর্ণাক্, ড্রমণ্ড, এবরক্রম্বি, লায়েল, নিবেট্, বক্লাণ্ড, লিবিন্, ডেবিসিন্, কমিসনর্

সীমসন্, ডাক্তর সীমসন্. কট্ক্লীফ্. হাইকোর্টের জজ জ্যাক্সন্, ডাক্তর ওয়াইজ, জে,পি, ওয়াইজ এবং মহারাণীর বডিগার্ড্ কাপ্তান ফেগুন্ প্রভৃতি অনেকানেক সাহেবগণ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। সময়ে২ সাহেবগণ শিকারে আসিলে তাঁহাদের খাদ্য ইত্যাদিতে কালীনারায়ণ রায়ের যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার উৎসাহ ভিন্ন কোন অংশেই কুটিলতা দৃষ্ট হয় না। অধুনা অতিথিসৎকার জন্য অতি দীর্ঘ একতালা একটী বাটি প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে যথাযোগ্য অতিথি সৎকার সম্পন্ন করিতেছেন। ঢাকা জেলার জজ, কালেক্টর, মাজিষ্ট্রেট্, কমিসনর সাহেব প্রভৃতি রাজপুরুষগণ ও সমধর্ম্মী জমিদারবর্গের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা সদালাপ সদ্ব্যবহার এবং প্রণয় সংস্থাপন চেষ্টাই দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বক্লাণ্ড্ সাহেব যখন ঢাকার কমিসনরী পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঢাকার দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার তীরদেশে পোস্তা দেওয়ার কারণ উক্ত সাহেব তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিলে তিনি এক

কালীন বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন এবং ঢাকাতে কৃষিপ্রদর্শনী মেলার সময়ে তিনি বহুবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া উৎসাহের সহিত উক্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১২৭১ সনে ভাওয়ালস্থ শ্রীপুর মৌজার অন্তর্গত টেঙ্গরা গ্রামে একটী উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, কালীনারায়ণ রায় বহু অন্বেষণে ঐ উল্কাপিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার পরীক্ষার্থে ঢাকায় প্রেরণ করেন তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া যায় এইক্ষণও ঐ উল্কাপিণ্ড ইংলণ্ডেই আছে। উক্ত উল্কাপিণ্ড ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলে পর কালীনারায়ণ রায় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদর্থে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন।

গোলোকনারায়ণরায়ের মৃত্যুর পর ১২৬৪ সনে কালীনারায়ণ রায় চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়া বিষ্ণু ঠাকুরের বংশীয় বেলগড়িয়া নিবাসী রামমোহন মুখোপাধ্যায় নামক রূপগুণ

সম্পন্ন এক কুলীন কুমারের হস্তে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনী স্বর্ণময়ী দেব্যাকে বিলক্ষণ সম্মান সৌজন্য ও ভদ্রতার সহিত সম্প্রদান করেন। তৎপর ১২৬৯সনে স্বীয় দুহিতা কৃপাময়ী দেব্যাকেও বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাসা নিবাসী বিলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক তদ্রূপ এক কুলীন কুমারের হস্তে সম্প্রদান করেন। উপরিউক্ত উভয় কর্ম্মই অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে।

কালীনারায়ণ রায় জমিদারীতে প্রবৃত্ত হইলে ঢাকার রাইমোহন ও রাধিকামোহন বাবুর সহিত, চাকলাদারদিগের সহিত এবং ঢাকার আরমাণী আরাকাণ সাহেবের সহিত ও কাশীমপুরের জমিদার শ্যামাপ্রসাদ রায়ের সহিত দেওয়ানী আদালতে ভূমি সম্পর্কীয় কয়েকটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি জয় লাভ করিয়া স্বকীয় ভূসম্পত্তির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

প্রজাহিতৈষিণী সভা।

কালীনারায়ণ রায় ভাওয়ালের প্রজাগণের নানারূপ হিতসাধনসঙ্কল্পে স্বয়ং চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া ভাওয়ালের সাতআনীর জমিদার বলধা নিবাসী ঘোষবংশীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁহার উছী শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং গাছা নিবাসী মহিমাচন্দ্র রায় ও ঐ ঘোষবংশের দৌহিত্রাংশ প্রাপ্ত জমিদার পূবাইল নিবাসী বসু বংশীয় দুর্গানাথ রায় প্রভৃতির সহিত ঐক্য বাক্যে ১২৭২ সনের ১০ই বৈশাখ প্রজাহিতৈষিণী নাম্নী একটী সভা স্থাপন করত সভ্যগণের অনুরোধে স্বয়ং সভাপতির পদ গ্রহণানন্তর ভাওয়ালে নানা প্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বাবধি ভাওয়ালে যে কতকগুলি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, নানারূপ কৌশল-গর্ত্ত

সুনিয়ম প্রচার দ্বারা তৎসমুদয় নিবারণ করেন। সময়ে২ প্রজাহিতৈষিণীর অধিবেশনে সভ্যদি-গের আলোচনায় যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তৎসংগৃহীত হইয়া প্রজাহিতৈষিণীর নিয়মাবলী নামক একখানা পুস্তক মুদ্রিত হ-ইয়াছে, তৎপাঠে ঐ সভার প্রায় সমুদয় নিয়ম জ্ঞাতব্য। পাঠকগণের গোচরার্থে তাহা হইতে কতিপয় বিষয় উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। ভাওয়ালের অনেক স্থান এমত আছে যে তথায় নদী বা দীঘী, পুষ্করিণ্যাদি না থাকায় প্রজাগণ নিতান্ত জলকষ্ট পাইয়া থাকে। কালীনারায়ণ রায় তৎক্লেশ নিবারণ মানসে স্থানে২ দীঘী, পুষ্করিণী ও কূপ খননার্থ এক-কালীন দশসহস্র টাকা দান করেন। ঐ টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া এপর্য্যন্ত যে কয়টী জলা-শয় খনন করা হইয়াছে তাহাতে অনেক স্থানীয় লোকের জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। এবং অবশিষ্ট টাকা দ্বারা জলক্লেশযুক্ত নানাস্থানে জলাশয় খননের উদ্যোগ হইতেছে।

২। ভাওয়ালের জমিদারগণ বৈলবেহারী অর্থাৎ বলদ দ্বারা সামগ্রী আনা নেওয়া, মোল্লা সেলামী, নৌকা প্রস্তুতের খোঁট গাড়ী, বেপারী মহাজনদিগের ক্রয় বিক্রয়ের পাইয়া জমা, বর্ণ ব্রাহ্মণদিগের যাজনিক ক্রিয়ার জমা, কৈবর্ত্তাদি হীনজাতির প্রধানী মর্য্যাদা প্রাপ্তের পাট্টা সেলামী ও বাদ্যকরদিগের বাজন্তী জমা ইত্যাদি নানাপ্রকার জমা যে প্রজাগণ হইতে গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ যাহা পঞ্চসনাতে লিখিত ছিল, তাহা এক প্রকার দৌরাত্ম্য ও কুপ্রথা বলিয়া সভাপতি কালীনারায়ণ রায় ঐ সকল নিয়ম উঠাইয়া দিয়াছেন।

৩। ভাওয়ালের প্রজাবর্গের মধ্যে যদি কেহ কোন সৎকার্য্য অর্থাৎ দুর্গোৎসব, মহোৎসবাদি সৎক্রিয়া করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে অগ্রে জমিদারদিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তৎকার্য্যের সনন্দ লইতে হইত। ঐরূপ সনন্দ না লইয়া কেহ কোন সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইতেন না। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ কি অন্য কোন কারণে বিনা সনন্দে উক্তরূপ কোন ক্রিয়া

করিতেন, তাহাহইলে জমিদারগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দণ্ডার্হ করিতেন। বিবাহাদি ক্রিয়াতে ও নহবত বাজাইতে কি চৌদলাদি দ্বারা চলন করিতে প্রজাবর্গের উক্তরূপ সনন্দ লইতে হইত। এইক্ষণ কালীনারায়ণ রায় ঐ সকল নিয়ম উঠাইয়া দিয়া প্রজাবর্গকে স্বেচ্ছানুরূপ জাঁকজমকসহ দুর্গোৎসব, মহোৎসব ও বিবাহাদি ক্রিয়া করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

৪। হিন্দুশাস্ত্রমতে নিতান্ত ধর্ম্ম বিগর্হিত কন্যাপণ যাহা বঙ্গদেশের প্রায় ঘরে২ বিরাজমান আছে, কালীনারায়ণ রায় ভাওয়ালের কি ভদ্র কি ইতর সমুদয় প্রজাকে আহ্বান করিয়া তদ্বিষয় নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া প্রস্তাব করিয়া সকলের সম্মতিমতে তন্নিবারণের এক প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করাইয়াছেন। যদিচ ভাওয়ালে সম্পূর্ণরূপে কন্যাপণ নিবারিত হওয়া বিশ্বাস হয় না, তথাপি এইরূপ পাপসঙ্কুল ঘৃণিত বিষয়ের মূলোৎপাটনে দৃঢ়তর যান্ত্রিক হওয়াতে কালীনারায়ণ রায় যে সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই। যদি কোন প্রজার

কন্যাপণ গ্রহণ করা তিনি শুনিতে পান, তবে তাহাকে যথোচিত শাসন করেন।

৫। ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাপ নিবারণেও তিনি দৃঢ়যাত্নিক হইয়া প্রজাবর্গের নিকট কয়েকটী সুদীর্ঘ ও সুমিষ্ট বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক নানাপ্রকার কৌশল প্রয়োগ ও অর্থব্যয়দ্বারা তন্নিবারণ সিদ্ধ করিতেছেন *। আদৌ প্রজাগণ কোন কুক্রিয়াতে রত নাহয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। পরে দৈবাৎ কোন বিধবার গর্ভসঞ্চার হইলে তাহা

---

* কালীনারায়ণ রায় প্রজাদের হিতার্থে প্রজা হিতৈষিণী সভাতে সময়ে২ যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে কন্যাপণ ও ভ্রূণহত্যা নিবারণ সম্বন্ধেও অনেকানেক সদুপদেশ আছে; তদ্ভিন্ন বহুবিবাহ নিবারণ, মাদক সেবন নিবারণ, হিংসাদি অহিত কার্য্য নিবারণ, ইন্দ্রিয় দোষ বর্জ্জন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ সদুপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ পুস্তক খানা পাঠ করিলেই সভাপতি মহাশয়ের বাক্‌পটুতা ও বক্তৃতা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ অল্পশিক্ষিতব্যক্তিগণ অনেকগুলি সদ্বিষয় শিক্ষা করিতে পারে।

কেহ বিনষ্ট করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ কায়িক মানসিক যত্ন প্রকাশ করেন। যদি কোন বিধবা গর্ভাবস্থায় নিঃসহায়া হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাকে বাসোপযোগী গৃহ ও ভরণপোষণ এবং সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তানেরও আহারীয় প্রদান করেন। এ পর্য্যন্ত ভাওয়ালে এই প্রকারের ২০০ টী শিশুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

৬। ভাওয়ালস্থ অন্ধ, আতুর প্রভৃতি দুঃখী প্রজাদিগের বাসস্থানের জমা মিনাহ দেওয়া হইয়াছে। দৈবঘটনাক্রমে কোন প্রজার গৃহ দগ্ধ হইয়া গেলে সভাপতি মহাশয় ঐ প্রজাকে একখানী গৃহ অথবা তাহার মূল্যোপযোগী টাকা প্রদান করেন। বিল বেলাই নামক স্থানের প্রজাগণের জমি যে বৎসর জলে প্লাবিত হইয়া শস্য প্রদান না করে, সেই বৎসর প্রজাগণ তাহা ঐ সভাতে বিশ্বাসযোগ্যরূপে জানাইতে পারিলে ঐ জমির করের দায় হইতে প্রজাগণ সেই বৎসরের জন্য মুক্তি লাভ করে।

৭। জয়দেবপুরের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র স্বয়ং ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিবাহ করিতে অক্ষম, তাঁহাদের বিবাহে প্রত্যেককে তিন শত টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরূপ দান প্রাপ্তে কয়েকটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভাওয়ালে যাহারা অল্প ব্যয়েও কন্যা প্রদান করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে ব্যক্তি বিবেচনায় কন্যা সম্প্রদানের খরচ প্রদান করিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত অনেক প্রজা ঐরূপ খরচ প্রাপ্ত হইয়াছে। জয়দেবপুর ব্যতীত ভাওয়ালের অন্য প্রজাও যদি স্বীয় ব্যয়ে বিবাহ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাদিগকেও ব্যক্তি বিবেচনায় সাহায্য প্রদান করেন। চান্দপ্রতাপের অন্তর্গত রোয়াইল নিবাসী কালী চক্রবর্ত্তী নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্বীয় ব্যয়ে বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন।

৮। ঐ সভা স্থাপনাবধি এখনও সময়ে২ উহার অধিবেশন হইয়া থাকে। সাময়িক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় ভাওয়ালের প্রজা-

গণকে আহ্বান করিয়া শস্যোৎপাদনাদি নানা বিষয়ের সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং নানা স্থান হইতে নানারূপ শস্যের বীজ আনাইয়া প্রজাগণকে অর্পণ করিয়া নানাপ্রকার উৎসাহ প্রদান করেন। প্রজাগণ তদনুসারে শস্যোৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে, অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি নিতান্ত সন্তুষ্টির সহিত তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন এবং সময়ে২ ঐ সভাতে তাঁহার কার্য্যকালীন ত্রুটি নিবন্ধন কাহারও কোন অনিষ্ট হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে সজল-নেত্রে বিনয়ের সহিত প্রজাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

প্রাগুক্ত নিয়মাবলী পুস্তকে যে সকল নিয়ম লিপীবদ্ধ হইয়াছে, সাময়িক অধিবেশনে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচিত ও বিবেচিত হইয়া তাহার কোন২ নিয়ম পরিবর্ত্তিত এবং কোন২ নূতন নিয়মও সংগৃহীত রূপে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইতেছে।

কালীনারায়ণ রায় তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র-

নারায়ণ রায়ের ১৩ বৎসর বয়ক্রমকালে ১২৭৭ সনে স্বকীয় বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত ও শরীর কাতরাবস্থায় থাকা হেতু সাংসারিক কার্য্যকর্ম্ম করিতে বিরক্তি বোধ হওয়াতে বিশেষতঃ কায়িক অসুস্থতা নিবন্ধন ভবিষ্যতের নিমিত্ত এক উইল্ অর্থাৎ নির্ণয়পত্র করেন এবং আপন বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি পূর্ব্বোক্ত রাসমোহন মুখোপাধ্যায়কে এবং আপন জামাতা বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সমুদয় কর্ম্মের ভার অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার বিশ্বাসি ও কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী চন্দ্রনাথ রায় ও হরনাথ রায়কে তাঁহাদের সহযোগী করিয়া স্বয়ং সাংসারিক কার্য্য হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু এখনও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, কোন প্রধান কার্য্য কি ঘটনা উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া করেন না।

১২৭৩ অব্দে কয়েকজন কুমন্ত্রির মন্ত্রণা প্রযুক্ত কোন এক বিষয় লইয়া কালীনারায়ণ রায়ের সহিত তাঁহার বিমাতা নীলমণী দেব্যা চৌধুরাণীর মনোবাদ হওয়ার বিলক্ষণ সোপান উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ও

তাঁহার দ্বিতীয় পরিণয়ের স্ত্রী, জয়মণী দেব্যা চৌধুরাণীর ও বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি, রামমোহন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে এবং হরনাথ রায় ও চন্দ্রনাথ রায় এই দুই কর্ম্মচারীর সৎপরামর্শে ঐ মনোবাদ বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া ক্রমে লয় হইয়া যায় ও সন্ধিপত্রদ্বারা বিবাদীভূত বিষয়ের মীমাংসা হয়। সুতরাং উপরিউক্ত কুমন্ত্রাদিগের মন্ত্রণা দেওয়া এবং মনোবেদনা মাত্রই সার হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত উইল লিখিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে কালীনারায়ণ রায় তাঁহার স্বকৃত ভূসম্পত্তি হইতে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী স্বর্ণময়ী দেব্যাকে বার্ষিক তিন সহস্র টাকা আয়ের ভূমি মিরাস পত্রের ন্যায় কতকগুলি সর্ত্তযুক্ত এক পত্রদ্বারা দান করিয়াছেন এবং স্বীয় কন্যা কৃপাময়ী দেব্যাকেও তিন হাজার অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক টাকা আয়ের ভূমি তদ্রূপ এক পত্রদ্বারা প্রদান করিয়াছেন। আর তাঁহার বাটীর লগ্ন পূর্ব্বাংশে তাঁহার কন্যাকে আপন ব্যয়ে একটী পাকা বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, ঐ বাটীর পূর্ব্বাংশে

উল্লিখিত বৈমাত্রেয় ভগ্নী স্বর্ণময়ী দেব্যাকেও তদ্রূপ একটী পাকা বাটী প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন, এখনও ঐ বাটী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন নাই। এইক্ষণ ঐ স্বর্ণময়ী দেব্যা তাঁহারই বাটীর পশ্চিম প্রকোষ্ঠে বাস করেন, কিন্তু পূর্ব্ব কথিত সন্ধিপত্রে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, যদি তাঁহার কি তাঁহার উত্তরাধিকারীর সঙ্গে ঐ স্বর্ণময়ী দেব্যার অবর্গ হয়, তবে সন্ধিপত্রের সর্ত্তমতে ঐ বাটী প্রস্তুত-করিয়া না দিয়া তাঁহাকে (স্বর্ণময়ী দেব্যাকে) উল্লিখিত প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারিবেন না।

এইক্ষণ কাশীনারায়ণ রায় চৌধুরীর ৫৮ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছে। তাঁহার শরীর গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট, চরিত্র গম্ভীর ও দয়াযুক্ত। যদিও এক বাঙ্গালাভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই, তথাপি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত জমিদারীর কার্য্যকলাপ অতি চাতুর্য্য সহকারে সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার জমিদারীর কার্য্য করার সময়ে কোন

প্রজার প্রতি কোন বিষয়ে বিরক্ত হইতে দেখা যায় নাই। কি ছোট কি বড় সকলের সহিতই সদতহাস্যবদনে মিষ্টালাপ করেন এবং সময়েং কৌতুকাবহ আলাপাদি করিয়াও সকলকে সন্তুষ্ট করেন। ক্ষুদ্র চাকর কি ক্ষুদ্র প্রজা বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। কাহাকেও কটু কথা কহা তাঁহার স্বভাবই নহে। যেরূপ কথাতে লোকে মনে ব্যাথা পায়, এমতকথা কখনও কাহার প্রতি প্রয়োগ করেন না। যদি কোন কার্য্য বশত কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তথাপি বাক্যা ভাসে কি আকার প্রকারে ঐ কোপ প্রকাশ হইবার নহে। কাহারো প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেও তাহা অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। ঐ কোপ আপন মনেই রাখিয়া ক্রমে বারণ করেন। এই বয়স পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদাই তিনি আমো-দের সহিত কালযাপন করিয়াছেন এবং এইক্ষণ পর্য্যন্তও বিলক্ষণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্বয়ং গান বাদ্য করিয়া থাকেন। গানবাদ্যে তান লয় জ্ঞানও বিলক্ষণ আছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে সময়ে সময়ে সখীসংবাদ গানের প্রসিদ্ধ

ওস্তাদদিগকে আনাইয়া তাহাদের সহিত গান করিয়া আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ করিয়া থাকেন। গত ১২৭৩ অব্দের দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নপূর্ণা ভৈরবী পূজা উপলক্ষে বহু অন্ন ব্যয় পূর্ব্বক মহাসমারোহের সহিত ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জগদীশ্বরের কৃপায় ঐ পূজার পর হইতেই ক্রমে দুর্ভিক্ষ নিবৃত্তি হইয়া আসে।

এইক্ষণ কালীনারায়ণ রায় সাংসারিক কার্য্য কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ পূর্ব্বক জয়দেপুরের উত্তরে আতলরা নামক স্থানে ঘোর অরণ্য মধ্যে একটী খামার বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে অনেকানেক প্রজাও বসাইয়াছেন। তিনি সময়ে২ তথায় যাইয়া ঐ বাটীতে বাস করেন এবং কৃষিকার্য্য দর্শন ও নির্জ্জনবাসের আনন্দ ভোগ করেন। তিনি শিশু বাতুল ও অজ্ঞ অর্থাৎ নির্ব্বোধদিগের সহিত আলাপ করিতে বড় ভালবাসেন এবং তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়া সুখী হন। তিনি আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রতিও যথেষ্ট দয়া করেন। দরিদ্রভাবাপন্ন আত্মীয় কুটুম্বগণকে

অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয়াদি প্রদান করিয়া দরিদ্রতা ঘুচাইতেছেন। এমন কি অনেক কুটুম্বের বাটীর নিকট স্বীয় ব্যয়ে জলাশয় খনন করাইয়া তাহাদের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন এবং স্বীয় ব্যয়ে অনেকের বিবাহ ও যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি ক্রিয়া করাইয়া দিয়াছেন। স্বকীয় কর্ম্মচারীগণের প্রতিও তিনি বিলক্ষণ দয়ালু; তাঁহার যে সকল কর্ম্মচারী বহুকাল যাবৎ তাঁহার সরকারে কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় কার্য্য করিতে অক্ষম হন, তিনি তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয়ের পুরস্কার পত্র দিয়া পেন্সন নিযুক্ত করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর করেন। তন্নিয়মানুসারে গুরুপ্রসাদ রায় দেওয়ান, নন্দকুমার মুন্সী হুজুরের মোক্তার, স্বরূপচন্দ্র নেউগী মপস্বলের কর্ম্মচারী, রামগোপাল বৈশ্য মহাফেজ এবং কালীশঙ্কর বিশ্বাস মহাফেজ ও বিক্রমপুরান্তর্গত সিমুলিয়া নিবাসী কৃষ্ণমণি সেন দ্বারস্থ কবিরাজ ইহাঁরা উক্ত প্রকারে পুরস্কার পত্র ও পেন্সন্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি লোকান্তরিত হইয়াছেন,

নন্দকুমার মুন্সীর মরণান্তে তাঁহার স্ত্রী উপায়-হীনা হওয়াতে, তাঁহাকে তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য মাসিক ৩ টাকা করিয়া প্রদান করিতে-ছেন। তাঁহার সময়েই এই সরকারে অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়া সুখে কার্য্য করিতেছেন এবং স্বস্ব কার্য্যদক্ষতানুসারে ক্রমে বর্দ্ধিতহারে বেতন পাইতেছেন।

দস্যু তস্করাদি ধৃতকরা সম্বন্ধেও কালীনা-রায়ণ রায় বিলক্ষণ সুচতুর ও অনুসন্ধানকারী। বাঙ্গলা ১২৭৯ সনের ৫ই অগ্রহায়ণ ভাওয়ালস্থ বলধা গ্রামে অনন্ত নাম্নী বারাঙ্গনার প্রাণ বধ করিয়া যে কতিপয় দস্যু পলায়ন করে, তাহারা তাঁহারই অনুসন্ধানে ধৃত হয়। ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য কতিপয় স্থানের দস্যু এবং তস্করও তাঁহার প্রযত্নে ধরা পড়িয়াছে, এজন্য গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বর্ত্তমান জমিদার ঘোষ বংশ।

এই বংশের আদিপুরুষগণের মধ্যে ইন্দ্র নারায়ণ ঘোষ পর্য্যন্ত জানা আছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তি-গণের নাম ও বিবরণ জানা নাই। অতএব উক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ হইতে বিবরণ লেখা যাইতেছে।

ভাওয়ালের অন্তর্গত গাছা গ্রাম নিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষই ভাওয়ালের সাত আনী হিস্যার জমিদারগণের আদি পুরুষ বলিয়া পরি-গণিত হইলেন। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের কালীচরণ ও শিবচরণ রায় নামক দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহারা একান্নে থাকিয়া কিছুকাল কায কর্ম্ম করেন, তৎপর শিবচরণ রায় নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করেন। কালীচরণ রায়ের বিশ্বে-শ্বর রায় ও রামচন্দ্র রায় নামক দুইপুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর রায় নিঃসন্তানাবস্থায় অল্পবয়সে

পরলোক যাত্রা করেন। রামচন্দ্র রায় বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্ব ও ভোগার্থ প্রভৃতি রূপে বিত্ত প্রদান করেন এবং নানাপ্রকার সৎকর্ম্ম করেন। তিনি অনেক ভদ্রলোককে তালুক, ভূমি ইত্যাদি প্রদান করিয়া ভাওয়ালে স্থাপিত করেন। এতদ্ভিন্ন খানে খোদাই ও পীরতানও অনেক প্রদান করেন। তাঁহার কৃষ্ণানন্দ রায়, শ্যামানন্দ রায়, রাম জগন্নাথ রায়, রামকিশোর রায়, রামানন্দ রায়, রামদুলাল রায় ও সদানন্দ রায় এই সাত পুত্র ছিলেন। তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার ঐ সাত পুত্র মধ্যে রামানন্দ রায়, রামদুলাল রায় ও সদানন্দ রায় দারপরিগ্রহ না করিতেই অল্প বয়সে লোকান্তরিত হন। অবশিষ্টগণ মধ্যে কৃষ্ণানন্দ রায়ের কালীপ্রসাদ রায় নামক এক পুত্র ও শ্যামানন্দ রায়ের হরপ্রসাদ ও রামদয়াল রায় নামক দুইপুত্র জন্মে। রামজগন্নাথ রায়ের স্ত্রী মহামায়া চৌধুরাণীকে এক কন্যা সন্তান সহ, রামকিশোর রায়ের স্ত্রী

করুণাময়ী চৌধুরাণীকে নিঃসন্তানাবস্থায় রাখিয়া রামজগন্নাথ ও রামকিশোর রায় পরলোক প্রাপ্ত হন। অনন্তর মহামায়া ও করুণাময়ী চৌধুরাণী কিছুকাল গাছা গ্রামেই জ্ঞাতিগণ সহ একান্নে কাল যাপন করেন। পরে কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী অতি প্রতাপশালী হইয়া নিতান্ত দুঃসাহসের সহিত কায কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে তৎপ্রযুক্ত তাঁহাদের পরস্পরের মনোবাদ আরম্ভ হওয়াতে হরপ্রসাদ, রামদয়াল রায় ও কালীপ্রসাদ রায় ও মহামায়া চৌধুরাণী এবং করুণাময়ী চৌধুরাণী আপোসে পৃথক হন। সাতআনী হিস্যা চারি তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া হরপ্রসাদ ও রামদয়াল রায় /১৫ পোণে দুই আনী, কালীপ্রসাদ রায় /১৫ আনী, মহামায়া চৌধুরাণী /১৫ আনী এবং করুণাময়ী চৌধুরাণী /১৫ আনী প্রাপ্ত হন। অনন্তর ১২১৩ অব্দে মহামায়া চৌধুরাণী গাছা গ্রামে বাস করা ক্লেশ জ্ঞান করিয়া গাছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন দুহিতা সহ পূবাইল গ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করেন এবং ঐ কন্যাটীকে

কাগমাইরের বসু বংশীয় কান্তনাথ বসুর নিকট বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে রুদ্রনাথ বসু নামক মহামায়া চৌধুরাণীর এক দৌহিত্র জন্মে। ঐ রুদ্রনাথ বসু দৌহিত্র সূত্রে মহামায়া চৌধুরাণীর দখল ভাওয়ালের উক্ত /১৫ আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া পূবাইল গ্রামে আসিয়া অবস্থিত হন।

১২১৫ সনে করুণাময়ী চৌধুরাণীও গাছা পরিত্যাগ করিয়া বলধাগ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করেন এবং তথায় যাইয়া কিছুকাল পরে রাধাকিশোর রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। গাছাতে কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরীও হরপ্রসাদ, রামদয়াল রায় চৌধুরী বাস করিতে থাকেন। কিয়ৎকালানন্তর হরপ্রসাদ ও রামদয়াল রায় চৌধুরী তাঁহাদের মাতা রামপ্রিয়া চৌধুরাণীকে এবং হরপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী নিরপত্যা অন্নপূর্ণা চৌধুরাণীকে ও রামদয়াল রায়ের স্ত্রী নিরপত্যা রাধালক্ষ্মী চৌধুরাণীকে রাখিয়া হরপ্রসাদ ও রামদয়াল রায় পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুকালে তাঁহাদের স্ত্রীদ্বয়ের

অতি অল্প বয়স ছিল। শুনাযায় ঐ সময়ে রামপ্রিয়া চৌধুরাণী অতি যশের সহিত কায কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন এবং তুলা পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি নানারূপ সংকার্য্য ও ইষ্টভক্তির একশেষ দর্শান। অনন্তর পুত্রবধূদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহাদের প্রতি সমুদয় ভার অর্পণ পূর্ব্বক তিনি কাশীধামে যাইয়া প্রায় ৩০ বৎসর কাল কাশী বাস করিয়া তথায়ই পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হন।

এদিকে কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এমত প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন যে, যদিও সাত আনীর চারি তুল্যাংশের একাংশভাগী ছিলেন, তথাপি তাঁহার হিস্যাকে বড় হিস্যা না বলিয়া কেহই পারিত না। শুনাযায় কালীপ্রসাদ রায় মধ্যে২ ভ্রমণোপলক্ষে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রজাদের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতেন এবং ।৵০ আনীর অন্যান্য অংশিগণের ও সময়ে২ঃ নয় আনীর তৎকালীন ভূম্যধিকারী গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত করিতেন। গোলোক নারায়ণ রায় চৌধুরী নিতান্ত ধৈর্য্যশালী

থাকাতে যাহা হওয়ার, মপস্বলেই হইয়া যাইত, তজ্জন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে নাই।

কালীপ্রসাদ রায়ের সময়ে একবার ।৶০ আনীর জমিদারী নিলাম হয়; ঢাকা নিবাসী হেরাপীট্‌ আরাতুন্‌ নামক এক আরমাণী সাহেব ঐ বিত্ত ক্রয় করিয়া ভারারিয়ার টেকে কাচারী স্থাপন করিয়া ॥৴০ আনীর প্রজার প্রতি নানা প্রকার দোরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে ॥৴০ আনীর তৎকালীন জমিদার গোলোকনারায়ণ রায় উত্যক্ত হইয়া উক্ত কালীপ্রসাদ রায়ের সহিত ঐক্যবাক্যে ঐ নিলাম রহিতের অনেক প্রকার চেষ্টা ও তদ্বির করেন, তাহাতেই ঐ নিলাম রহিত হইয়া কালীপ্রসাদ রায় প্রভৃতি পুনরায় জমিদারী প্রাপ্ত হন। অল্প কাল মধ্যে উক্ত সাহেব ॥৴০ আনীর শালনা মৌজার খৈধানা নামক বাইদ ইত্যাদি কতকগুলি স্থান ।৶০ আনীর রাঘল বাড়ী মৌজার সামীল দখল করার উদ্যোগী হইয়া কতিপয় অস্ত্রধারী লোক

নিযুক্ত করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে শালনা গ্রাম, জয়দেবপুর নিবাসী কেবলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও কানুরাম সীকদারের নিকট ইজারা ছিল। তাহারা ঐ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শালনার কয়েকজন কোচ জাতীয় প্রজা সংগ্রহ পুর্ব্বক বিবদমান স্থানে উপস্থিত হন। উক্ত কেবলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত বীর্য্যসম্পন্ন ও পরাক্রমশালী লোক ছিলেন; ধান্যকাটা সম্বন্ধে তথায় বিবাদ আরম্ভ হইলে কেবলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রথমতঃ অগ্রসর হইয়া ঐ সাহেব পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধা সেক জঙ্গু পলান নামক ব্যক্তিকে এক যষ্টি প্রহার করেন ঐ আঘাতেই উক্ত পলান ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তৎপর সাহেব পক্ষীয় অন্যান্য লোক পৃষ্টভঙ্গ দিয়া পলায়নমান হয়। অনন্তর সাহেব, কথিত কেবলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে ফৌজদারীতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু আসামিগণ নিরপরাধীরূপে মুক্তি পায়। সাত আনীর জমিদারী সম্বন্ধে সতত উক্তরূপ নানাবিপদ উপস্থিত হওয়াতে নয় আনীর

ভূম্যধিকারীদিগকে ও প্রজাদিগকে সর্ব্বদা আনুষঙ্গিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কালীপ্রসাদ রায়ের দৌরাত্ম্যে ।৷/০ আনী ও ।৶০ আনীর প্রজাগণ নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। ধান্যাদি শস্য পক্ক হইলেই তাহা কাটাইয়া নেওয়ার একটা মহা ধুমধাম গোলযোগ উপস্থিত হইত। একদা পূবাইলের মহামায়া চৌধুরাণী ভ্রমণোপলক্ষে সাক্‌সা গ্রামে যাইয়া জগন্নাথ সরকার নামক এক প্রজার বাটীতে বাসা করিয়া থাকেন, তৎকালে কালী-প্রসাদ রায় চৌধুরীও ভ্রমণোপলক্ষে তথায় যাইয়া বাসা লইয়া মহামায়া চৌধুরাণীর সহিত ভয়ানক এক বিবাদ উপস্থিত করেন। ক্রমে বিবাদ বর্দ্ধিত হইয়া তথায় ঘোরতর এক দাঙ্গা হইয়া যায়। ঐ দাঙ্গাতে কালীপ্রসাদ রায়ের পক্ষীয় সীতারাম ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি-কর্ত্তৃক মহামায়া চৌধুরাণীর পক্ষের আতিউল্লা নামক একজন সরদার নিহত হয়। তৎপর ফৌজদারীতে ঐ হত্যা কাণ্ডের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া কালীপ্রসাদ রায় ও সীতারাম

ঠাকুর প্রভৃতির পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত কারাবাস দণ্ড হয়। কালীপ্রসাদ রায় তাঁহার পুত্র ১০ কি ১২ বৎসর বয়স্ক কালীকিশোর রায়কে বাটীতে রাখিয়া কারাগারে প্রবেশ করেন। তাঁহার পাঁচ বৎসর কয়েদের কিয়ৎকাল বক্রী থাকিতেই শারীরিক নিতান্ত পীড়িত হওয়াতে অনেক তদ্বিরে তৎকালীন ডাক্তর লেম্ সাহেব কর্ত্তৃক রিপোর্ট ইত্যাদি দেওয়াইয়া মুক্তি পাইয়া বাটীতে আসেন।

কালীপ্রসাদ রায় কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাটীতে আসিয়া তাঁহার পুত্র কালীকিশোর রায়ের বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ঐ ক্রিয়াতে কতক টাকা ঋণগ্রস্ত হন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি কালীকিশোর রায় পুত্রকে বর্ত্তমান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কালীকিশোর রায় পল্টন তেওয়ারী নামক একজন দেশওয়ালীকে আপন সরকারে নায়েব নিযুক্ত করেন এবং তাহার সহিত এক পরামর্শে বলধার করুণাময়ী চৌধুরাণীর দত্তক রাধাকিশোর রায়ের সহিত

একটী মোকদ্দমা করেন। অর্থাৎ করুণাময়ী চৌধুরাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতি দত্তক রাখার অনুমতি ছিলনা বলিয়া তাঁহার দত্তক পুত্র রাধাকিশোর রায়কে দত্তক নামঞ্জুর করার কারণ কালীকিশোর রায় মোকদ্দমা উপস্থিত করেন; প্রকৃতার্থেও ঐ অনুমতির প্রতি সন্দেহ ছিল। মোকদ্দমায় কালীকিশোর রায়ের জয় লাভ হওয়ার উপক্রম দেখিলে রাধাকিশোর রায়ের নায়েব ভাওয়ালস্থ ব্রাহ্মণ গ্রাম নিবাসী রামলোচন মিত্র নামক সুচতুর এক ব্যক্তি নানা কৌশল ক্রমে কালীকিশোর রায় ও তাঁহার নায়েব পল্টন তেওয়ারীকে বশীভূত করিয়া নগদ ৫০০০৲ টাকা ও রাধাকিশোর-রায়ের /১৫ আনী হিস্যার ৻৫ পাই হিস্যা কালীকিশোর রায়কে দেওয়াইয়া সন্ধি করেন। ঐ সময়ে যদিও কালীকিশোর রায়ের আত্মীয় অনেকেই উক্ত সন্ধি কার্য্যে বাধা জন্মাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কালীকিশোর রা-য়ের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অতঃপর কালীকিশোর রায় স্বীয়

পৈতৃক হিস্যা /১৫ আনী ও রাধাকিশোর রায় হইতে প্রাপ্ত ৫ পাই, এই ৵০ আনী হিস্যার মালীক দখিলকার হইলেন।

কালীকিশোর রায় নিতান্ত বুদ্ধিবিবেচনা হীন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিযুক্তীয় নায়েব পল্টন তেওয়ারীও তদ্রূপই ছিল, সুতরাং তাঁহার সাংসারিক আয়ব্যয় নিতান্ত বিশৃঙ্খলরূপে চলাতে তাঁহার পিতৃকৃত অল্প পরিমিত ঋণই আদায় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অতএব ঐ ঋণ পরিশোধার্থ প্রসিদ্ধ জমিদার ওয়াইজ সাহেবের নিকট খোস কওয়ালা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ৵০ আনি হিস্যার /১২॥ গণ্ডা বিক্রয় করিলেন।

কালীপ্রসাদ রায়ের যদিও অন্যান্য বিষয়ে অনেক দোষ ছিল, কিন্তু ইষ্টদেবতা বিষয়ে দৃঢ়তর ভক্তি থাকা শুনাযায়। তিনি পুরশ্চরণ প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া তাঁহাদের ইষ্ট দেবতা এলাঙ্গা নিবাসী ভট্টাচার্য্যদিগকে যে তালুক ও বিত্ত প্রদান করিয়াছেন এইক্ষণও ঐ সমস্ত বিত্ত হইতে উক্ত ভট্টাচার্য্যগণ বার্ষিক প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা উপস্বত্ব লাভ করিতেছেন।

কালীকিশোর রায় চৌধুরী জমিদারীর স্বকীয় হিস্যার প্রায় সমুদয় অংশই ওয়াইজ সাহেবের নিকট বিক্রয় করিয়াও ঋণ পরিশোধ-করিতে অসমর্থ হওয়াতে বক্রী ৭৷৷ গণ্ডা হিস্যা বিক্রয় করার কারণ জয়দেবপুরে আসিয়া গোলোকনারায়ণ রায়কে জ্ঞাপন করেন; কিন্তু পরম দয়ালু গোলোকনারায়ণ রায় তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্বকীয় পুত্র কালীনারায়ণ রায়কে ঐ বিত্ত ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া, বিত্ত রক্ষার্থে ঐ হিস্যা দীর্ঘকালের ম্যাদে ইজারা রাখিয়া টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করাইয়া দেন। ইহার পর কালীকিশোর রায় নিতান্ত দুরবস্থার সহিত কিছুকাল জীবিত থাকেন। তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হওয়াতে তিনি জীবদ্দশাতেই মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। এইক্ষণ উল্লিখিত ইজারার ম্যাদ অতীত হও-য়াতে ঐ ৭৷৷ গণ্ডা হিস্যায় উক্ত মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী মালীক দখিলকার হইয়াছেন।

অনুমান ছয় বৎসর হইল, কালীকিশোর রায় চৌধুরী পরলোক গমন করিয়াছেন। এই

পর্য্যন্তই উক্ত ঘোষ-বংশীয় জমিদারদিগের মূল বংশের লোপ হইয়া কেবল কালীকিশোর রায়ের স্ত্রী শিবসুন্দরী চৌধুরাণী ও রামদয়াল রায়ের স্ত্রী রাধালক্ষ্মী চৌধুরাণী এপর্য্যন্ত বর্ত্তমানা আছেন। সাত আনীর যে সমস্ত বিত্ত ওয়াইজ সাহেবের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল, তাহা কালীকিশোর রায় জীবিত থাকিতেই, নয় আনীর জমিদার গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী ও তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ওয়াইজ সাহেব হইতে ক্রয় করিয়া লন। তদ্বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে।

পূবাইল নিবাসী মহামায়া চৌধুরাণী তাঁহার দৌহিত্র রুদ্রনাথ রায় চৌধুরীকে বর্ত্তমান রাখিয়া কালপ্রাপ্তা হন। রুদ্রনাথ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পানাদি দোষের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা কেবল গান বাদ্যেই রত থাকিতেন এবং তন্নিবন্ধন অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেন। এপ্রযুক্ত শীঘ্রই ঋণগ্রস্থ হইয়া ঐ ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর বিহীন হওয়াতে ক্রমে খোসকবালা দ্বারা নিজ ভূসম্পত্তি ভাওয়ালের ৵১৫ আনীর

/১৮/১০ এক আনা সাতকড়া দেড়ক্রান্ত ওয়াইজ সাহেবের নিকট বিক্রয় করেন। ইহার কিছুকালান্তর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার সন্তান না থাকায় মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রীকে পোষ্যপুত্র রাখিতে অনুমতি প্রদান করিয়া যান; তদনুসারে তাঁহার স্ত্রী দুর্গানাথ রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। এইক্ষণ সেই দুর্গানাথ রায়চৌধুরী ভাওয়ালের সাতআনী অংশ জমিদারীর .১৩/১০ তেরগণ্ডা দেড়ক্রান্ত অংশের মালিক দখলকার আছেন। রুদ্রনাথ রায় ওয়াইজ সাহেবের নিকট যে /১৮./১০ ক্রান্ত বিক্রয় করেন, তাহাও গোলোকনারায়ণ রায় ও কালীনারায়ণ রায় কৌশলক্রমে ওয়াইজ সাহেব হইতে ক্রয় করিয়া লন।

বলধা নিবাসী রাধাকিশোর রায় দুইটী বিবাহ করেন, তাঁহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্যা জন্মিবার কিছুকাল পরেই ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে রাধাকিশোর রায়ও বায়ুর পীড়াতে ক্ষিপ্তপ্রায় হন এবং অন্য বিবাহ করিতে একান্তই অসম্মত হন, কিন্তু তাঁহার তৎকা-

লীন নায়েব আউচপাড়া নিবাসী গোকুলচন্দ্র হোড় নানারূপ কৌশলক্রমে ঐ ক্ষিপ্তাবস্থাতেই তাঁহাকে আর একটী বিবাহ করান। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিতছিলেন, বায়ুর প্রবলতায় বাক্রুদ্ধ প্রায় হইয়া এক গৃহেই সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন। এবং কোন ফকিরের গলায় তজবী অথবা কোন ব্যক্তির গলায় তাবিজ কি মালা ইত্যাদি দেখিলে যে প্রকারেই হউক তাহা নিয়া আপন অঙ্গে ধারণ করিতেন। তাঁহার এমত এক ভয়ানক সন্দেহ বায়ু ছিল যে, আপন হস্তের পাক করা ব্যতীত অন্য কাহারো পাক করা বস্তু আহার করিতেন না। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল জীবন ধারণ পূর্ব্বক প্রথম পরিণয়ের স্ত্রীর গর্ভজাতা এক কন্যা ও দ্বিতীয় পরিণয়ের স্ত্রী জগত্তারা চৌধুরাণীকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন। অনন্তর জগত্তার চৌধুরাণী ঐ সপত্নী কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন ও হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ঐ কন্যাটী গর্ব্ভজাত একটী পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিতা হন।

তাহার কিয়ৎকাল পরেই জগত্তারা চৌধুরাণীও হরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এইক্ষণ ঐ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ভাওয়ালের সাত আনী অংশ জমিদারীর দেড় আনী অংশে মালিক দখিলকার আছেন।

গাছা নিবাসী হরপ্রসাদ্ রায় ও রামদয়াল রায় চৌধুরী আপন২ বিবাহ সময়ে ঢাকার বন গ্রাম নিবাসী জয়কৃষ্ণ বসাক হইতে কতক গুলি ঋণ করিয়া যান, ঐ টাকা আদায় না হওয়ায় ও ক্রমে সুদ বর্দ্ধিত হওয়াতে আদালতে নালিশ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে তাঁহাদের নায়েব পলাসোনা নিবাসী ঘোষ বংশীয় রঘুনাথ রায় ও গাছা নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের পক্ষে প্রতুল কারণ নানা প্রকার কৌশলের সহিত চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইলেন না। বিচারে জয়কৃষ্ণ বসাকের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক ডিক্রী প্রাপ্ত হন। তৎপর ওয়াইজ সাহেব নানা কৌশল ক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক হইতে অতি অল্প মূল্যে বিনামা করিয়া ঐ ডিক্রী ক্রয়

করেন, যেকাল পর্য্যন্ত ভাওয়ালের নয় আনীর জমিদারের সহিত ওয়াইজ সাহেবের বিবাদ ছিল, সেইকাল পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী জারী করেন নাই। পরে ঐ নয় আনীর জমিদারের সহিত ওয়াইজ সাহেবের সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইয়া গেলে, ঐ ডিক্রীজারী ক্রমে ১০০১ টাকা মূল্যে হরপ্রসাদ ও রামদয়াল রায় চৌধুরীর /১৫ আনী অংশ ওয়াইজ সাহেব নিলামে ক্রয় করেন। তৎপর গোলোকনারায়ণ রায় যখন ওয়াইজ সাহেবের ভাওয়ালের ক্রীত ভূমি ক্রয় করেন, তখন ওয়াইজ সাহেব ইহার প্রত্যেক আনাতে একলক্ষ টাকা হারে মূল্য লইয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ রায় ও রামদয়াল রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহাদের স্ত্রীদ্বয় প্রত্যেকে এক একটী দত্তক গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে উভয়ের দত্তকেরই মৃত্যু হয়, তৎপর হরপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী আর দত্তক গ্রহণ না করিয়া কাশীধামে যাইয়া বাস করেন এবং তথায়ই পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হন। রামদয়াল রায়ের স্ত্রী তৎপরও ক্রমে দুইটী দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য

বশতঃ সকল দত্তকই তাঁহার সমক্ষে লোকান্ত-রিত হইয়াছেন, কেবল তৃতীয় দত্তক গুরুদয়াল রায়ের একটী শিশু পুত্র আছে।

পরিশিষ্ট।

বহুদিন পূর্ব্বে ভাওয়ালের অন্তর্গত বরথা ও জোলারপারের নিকটবর্ত্তী নাগবাড়ী নামক স্থানে কায়স্থ কুলজ নাগবংশ বিলক্ষণ জাগ্রৎ ছিল। বোধ হয়, ভাওয়ালে যখন ব্যাঘ্র ভল্লু-কাদি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ঐ বংশীয় ব্যক্তিগণ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বক্তারপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। শেষোক্ত স্থানে ঐ বংশের বংশধরগণ এইক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। উল্লিখিত নাগবাড়ী নামক স্থানে উক্ত নাগবংশের প্রাচীন-বাটীর অট্টালিকাদির ও দীর্ঘিকাদির চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মার্ত্তাগ্রামে খড়্গেশ্বর ঘোষ (দ্বিতীয় নাম ভাগ্যবন্ত ঘোষ) নামে একব্যক্তি অত্যন্ত ধনাঢ্য

ও মহা কীৰ্ত্তিভাক্ ছিলেন। এদেশীয় বহুসংখ্যক ইতর লোক তাঁহার একান্ত বশীভূত ছিল, তাহাদের সাহায্যে তিনি নানাপ্রকার অলৌকিক কীর্ত্তিসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন! এদেশীয় লোক-পরম্পরা জনরব চলিয়া আসিতেছে যে, খট্টেশ্বর ঘোষের কয়েকটা ভূত বশীভূত ছিল, তদ্দ্বারা ঐ সকল অদ্ভুত কার্য্য অনায়াসে অত্যল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু এ জনরব নিতান্তই ভ্রমমূলক; ফলতঃ বহুসংখ্যক লোক তাঁহার একান্ত বাধ্য থাকা প্রযুক্ত, তাহাদের সহায়তায় অত্যল্প সময়ে এক একটী বহ্বায়াসসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করাতেই, লোকে উল্লিখিত রূপ ভূত বাধ্য থাকা বলিত। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই বিস্ময়জনক।

১। খট্টেশ্বর ঘোষ এক বাটীতে অধিক কাল বাস্তব্য করিতে ভাল বাসিতেন না, নূতন২ বাটী প্রস্তুত পূর্ব্বক কিছুকাল করিয়া এক এক বাটীতে বাস করায় নিতান্ত প্রিয় ছিলেন। তদনুসারে মার্তাগ্রামে এক বাটী ও তাহার কয়েক ক্রোশ অন্তর ভাহুন গ্রামে ক্রমে ৯০ খানা বাটী

প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার ঐ সকল বাটীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহন গ্রামে খটেশ্বর ঘোষ ৯০ খানা বাটী প্রস্তুত করাতে এখনও অনেকে ঐ গ্রামের নাম নব্বইবাটী বলিয়া থাকে।

২। পূবাইলের উত্তর হইতে চিলাই নামক এক খাল খনন করিয়া চল করেন এবং তাহার উভয় তীরস্থ তীতারকুল ও বলধা গ্রামের নিকট দিয়া এক সড়ক প্রস্তুত করিয়া লোক যাতায়াত জন্য উহাতে এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন, ঐ সেতু এইক্ষণ নাই, তাহার চিহ্ন মাত্র প্রতীয়মান হয়*।

৩। চিলাই খনন কালে তাহার মৃত্তিকা দূরে ফেলিয়া যেখানে আগৈল (টুকরী) ঝারিত ঐ স্থানে ঐ আগৈলের মৃত্তিকায় বৃহৎ এক টেক উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগৈল ঝারার টেকা বলে।

---

* এইক্ষণ কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর ঐ স্থান দিয়া চিলাইর উপর এক কাষ্ঠ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৪। মার্ত্তা ও কেশরীতা গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ জলের চল আছে, ঐ স্থানেও উল্লিখিতরূপ একটী সড়ক নির্ম্মিত দৃষ্ট হয় এবং মার্ত্তার উত্তর নানাইয়ার দিকে দ্বিতীয় এক সড়ক প্রস্তুত আছে। এই সকল সড়ককে অদ্যাপি ঐ অঞ্চলের লোকে কেহ ভাগাইর বাঁধ, কেহ খাইটা ঘোষের বাঁধ বলিয়া থাকে।

৫। খট্টেশ্বর ঘোষ মার্ত্তা হইতে নব্বই বাড়ী (ভাতুন) পর্য্যন্ত যাওয়ার নিমিত্ত খুন্দিয়া নামক স্থানের দক্ষিণাংশ দিয়া নৌকা চালাইয়া প্রাগুক্ত চিলাই পর্য্যন্ত আসিতেন, ঐ স্থান দিয়া কোন খাল ছিল না ও খাল কাটাইবারও সম্ভাবনা ছিলনা, পথে সরিষা ঢালিয়া তাহার উপর দিয়া ছোট নৌকা চালাইয়া উল্লিখিত চিলাই নামক খালে আসিতেন এবং তথা হইতে বড় নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক নব্বই বাটীতে পৌঁছিতেন। পুনঃ২ ঐরূপ করাতে ঐ স্থান ক্ষুদ্র এক খাল হইয়া সরিষাখালী নামে প্রকাশ পায়।

৬। বেলাই বিল হইতে চিলাই পর্য্যন্ত

আসিবার জন্য বলধা গ্রামের উত্তরাংশে দিয়া এক খাল কাটাইয়া দেন। মার্ত্তার বাথান বাড়ী হইতে ভাতুন দুগ্ধ নেওয়ার সময় ঐ খালে দুগ্ধের চুঙ্গা ধৌত করিত, তাহাতে ঐখালের নাম চুঙ্গাধোলাই হইয়াছে।

৭। খট্টেশ্বর ঘোষ এ অঞ্চলের নানা স্থানে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা পুষ্করিণীও খনন করিয়াছিলেন। হয়দরাবাদ, দীঘির চালা প্রভৃতিস্থানে প্রধান২ দীর্ঘিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। এই পরগণার উত্তরাংশে শ্রীপুর গ্রামে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার নাম হদ্দের দীঘি রাখেন। কারণ তাঁহার কীর্ত্তিও এই দীর্ঘিকা কাটানতকই শেষ হয়। ঐ দীর্ঘিকাকে এখনও লোকে হদ্দের দীঘি বলে।

প্রবাদ আছে যে, খট্টেশ্বর ঘোষ উল্লিখিত কীর্ত্তি সমস্ত সমাধা করিয়া রাজধানী দিল্লী দর্শনার্থ যাত্রা করেন। তাঁহার তিন স্ত্রীর মধ্যে একজন অতি রূপবতী ও সাধ্বী এবং তাহার একান্ত বাধ্যা ছিলেন। ঐ স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য একান্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু

নবাবী আমলে কাহারো স্ত্রী বাটীহইতে বাহিরে গেলে নিতান্ত অপমান হইতে হয়, এমন কি জাতির প্রতিই ব্যাঘাত জন্মিত। অতএব তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া অবশেষ বলিয়া যান যে, "আমার পোষা এক জোড়া কবুতর সঙ্গে লইয়া যাই, তাহা ছুটিতে পারিলে আমার বাড়ী ভিন্ন অন্যত্র যাইবে না। যদি আমি আমার পূর্ব্বে ঐ কবুতর আমার বাটীতে আসে, তবে আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিবে।" অনন্তর কতিপয় দিবস পরে কোন ঘটনাক্রমে পথ হইতে ঐ কবুতর ছুটিয়া তাঁহার বাটীতে আসে। ঐ কবুতর দেখিয়া তাঁহার ঐ বাধ্যা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হওয়া নিশ্চয় করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন জন্য ভাদুনের নিকটস্থ সোরোল নামক গ্রামে চিলাই খালের পারে এক অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করেন এবং স্বামীর চিহ্ন স্বরূপ উক্ত কবুতরদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া তৎসহ ঐ কুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে খট্টেশ্বর ঘোষ বাটীতে আসিয়া উক্ত ঘটনা শ্রবণ-স্ত্রীর-শোকে

অধৈর্য্য হইয়া ঐ কুণ্ডে পুনঃ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এইক্ষণ ঐ কুণ্ডের পারে এক বট বৃক্ষ আছে, তাহাকে কুণ্ডের বৃক্ষ বলে। উক্ত খড়্গেশ্বর ঘোষের বংশধরগণ এখন বাড়ীয়া গ্রামে পূর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থায় বাস করিতেছেন।

প্রাচীনকালে ভাওয়ালে আড়াই ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল শুনাযায়। আড়াই ঘর থাকা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে, তিনঘর ছিল। তন্মধ্যে আচার্য্য সিংহ ও পদ্মনাভ এই দুই ঘর এবং নলজানির চক্রবর্ত্তী এক ঘর। নলজানির চক্রবর্ত্তীরা পূর্ব্বোক্ত দুই ঘর অপেক্ষা মর্য্যাদায় ন্যূন ছিলেম বোধ করি তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে অর্দ্ধঘর বলে। যাহা হউক অদ্যাপিও ঐ আড়াই ঘরই ভাওয়ালে মর্য্যাদার সহিত আছেন; কিহেতু যে তাঁহারা মার্য্যাদাশালী, বলাযায় না। অনুমান হয় তাঁহারা ভাওয়ালের আদিম অধিবাসী বলিয়াই সমধিক মর্য্যাদাপন্ন আছেন।

গাজীদিগের আমলে ভাওয়ালে ভদ্র

লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, উক্ত আমলের পর নয় আনী, সাত আনীর জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু চেষ্টা ও উদ্যোগে নানাস্থান হইতে দক্ষিণভাগের ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আনয়ন করিয়া যথোচিত তালুক জমি বিত্ত প্রদান পূর্ব্বক সংস্থাপন করেন, তাহাতেই ভাওয়ালে নয় আনী ও সাত আনী মধ্যে অন্যূন ৫০০ নম্বর তালুক হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন তালুকের উপস্বত্ব এত অধিক যে অন্যান্য স্থানের কোন২ ক্ষুদ্র জমিদারীর উপস্বত্বের তুল্য হয়। অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর তালুকদারগণ মধ্যে কেহ চারিহাজার কেহ পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত বার্ষিক লাভ পান। ভাওয়ালের জমিদারগণ অত্রত্য ব্রাহ্মণের বাস্তু স্থানের কর গ্রহণ করেন না, এতদ্ভিন্ন দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব, লাখেরাজ, ভোগার্থ ও পীরপাইন প্রভৃতিতে অনেক জমি প্রদত্ত হইয়াছে। নয় আনী ও সাত আনীর সমুদয় লাখেরাজ জমির জমাবন্দী করিলে বোধ হয় ৭। ৮ হাজার টাকা স্থিত হইবে।

ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের শাসন কালীন গাজী-বংশীয়গণ পুনরায় ভাওয়াল পরগণা আপন হস্তগত করার মানসে বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক নয় আনী ও সাত আনী অংশ জমিদারী দখলের উদ্যোগ করেন এবং প্রথমেই জয়দেবপুর আক্রমণে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু ইন্দ্র-নারায়ণ রায়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা অতি বৃহৎকায় ও অলৌকিক বীর্য্যসম্পন্ন পীতাম্বর রায় (ভাগ্যবন্ত রায়) ও কামদেব রায়ের সহায়তায় এবং পরাক্রমে তাঁহাদের (গাজী বংশীয়দের) সেই কৃত উদ্যম কোন ফলপ্রদ হয় না *।

* ভাগ্যবন্ত রায় ও কামদেব রায় যে অত্যন্ত বৃহৎকায় ও অসাধারণ বলশালী ছিলেন, তাহার নিদর্শন এখন ও নানারূপেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কামদেব রায়ের একজোড়া কাষ্ঠ পাদুকা আছে, তাহা পরিমাণে এক ফুটেরও কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ. ভাগ্যবন্ত রায়ের বসিবার একখানা কাষ্ঠাসন আছে যাহা প্রায় তিন হস্ত দীর্ঘ ও আড়াই হস্ত প্রস্থ, কিন্তু ভাগ্যবন্ত রায় ঐ আসনে বসিলে তাহাতে স্থান মাত্রও অবশিষ্ট

গাজী বংশীয়গণ লোকজন সহ জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে উক্ত ভাগ্যবন্ত রায় ও কামদেব রায় অলৌকিক সাহস সহকারে গাজীগণকে দলবল সহ তাড়াইয়া দেন। তাহাতেই নয় আনী ও সাত আনী জমিদারী রক্ষা পায়। গাজী বংশীয়গণ তদবধি নিস্তেজ ভাবেই কালযাপন করিতেছেন।

সম্পূর্ণ।

থাকিত না। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ভাগ্যবন্ত রায় ও কামদেব রায় এ অঞ্চলে দুইটী বিখ্যাত বীর পুরুষ ছিলেন। যে সময়ে তাঁহারা ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের জমিদারী রক্ষা করেন, তখন মনে করিলে অনায়াসেই ঐ জমিদারী আপন হস্তগত করিতে পারিতেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে [illegible] যাহাতে আপন জ্ঞাতির বিত্ত রক্ষা ও মঙ্গল সাধন হয়, তাঁহারা তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন।